প্রকাশ : ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৬।

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে
শান্তিনিকেতন পুস্তকপ্রকাশসমিতির পক্ষ থেকে
ক্ষিতীশ রায় কর্তৃক প্রকাশিত।

শান্তিনিকেতন প্রেসে শ্রীবিদ্যুৎরঞ্জন বসু কর্তৃক মুদ্রিত

আমাদের শ্রদ্ধাভাজন লোকান্তরিত সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায় সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত ছিলেন তাঁর 'সু' নামে। যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা সকলেই জানেন এই ছোট্ট নামটি তাঁকে যে-ভাবে বিশেষিত করত তেমনটি সচরাচর ঘটে না। পরিশিষ্টে তাঁর সুন্দর জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

গুরুদেবের জন্মশতবর্ষপূর্তি নিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই আলাপ আলোচনা হত। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে অনুরোধ জানিয়ে এসেছিলাম তিনি যেন পঁচিশে বৈশাখের তাৎপর্য বিষয়ে ছোটদের জন্য কিছু লেখেন। তিনি যে আমার অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন, এই পুস্তিকা তার প্রমাণ। আমি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম গুরুদেবের স্মৃতির উদ্দেশে তাঁর এই প্রণাম শতবর্ষপূর্তি উৎসবের উপলক্ষ্যে যথাস্থানে নিবেদন করে দেব। তদনুসারে 'পঁচিশে বৈশাখ' ছোটদের হাতে তুলে দেওয়া হল। ইতি ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮।—ক্ষিতীশ রায়।

প্রতি বৎসর ২৫শে বৈশাখে তোমরা রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব করে থাক। এ বৎসর (১৩৬৮ সালে) পঁচিশে বৈশাখে তার জন্মশতবার্ষিক উৎসব তোমরা মহা আড়ম্বরে করছ। তোমরা কি কখনও ভেবে দেখেছ বাংলা দেশে, সারা ভারতে এবং ভারতের বাইরে নানা দেশে এই উৎসব উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা কেন হয়েছে ? রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা বাঙালীরা বিশেষ করে কী পেয়েছি—ভারতবাসী কী পেয়েছে পৃথিবীর লোকে কী লাভ করেছে যার জন্য আজ সর্বত্রই তার জন্মশতবার্ষিক উৎসব মহা সমারোহে উদ্‌যাপিত হচ্ছে ?

আমরা জন্মদিন পালন করি তাঁরই যাকে আমরা ভালবাসি। রবীন্দ্রনাথকে আমরা সবাই ভালবাসি, কেননা তার মত দরদী বন্ধু আমাদের জীবনপথে কে আছে ? আমাদের সুখে দুঃখে আনন্দে উৎসবে রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, রচনাবলী চিরসাথীর মত কত সাহায্য করে, কত আনন্দ দেয়, তা বলে শেষ করা যায় না। আমাদের ব্যক্তিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, নানা অবস্থায় আমাদের সঙ্গে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের রচনা ও জীবনের আদর্শ। তাঁর জন্মশতবার্ষিক উৎসবের দিনে তাঁকে হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে আমাদের অন্তরের ভালবাসা অর্পণ করি—সঙ্গে সঙ্গে বোঝবার চেষ্টা করি তাঁর কাছ থেকে আমরা কী পেয়েছি—তাঁর কাছে আমরা কত ঋণী।

আজ থেকে একশো বছর আগে ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ, ইংরেজি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) সততা, সাধুতা ও ভগবৎ ভক্তির জন্য সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন

খুব ধনী পরিবারে। তার পিতা অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদাদা ছিলেন প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬)। তিনি সে সময়ের বাংলাদেশে একজন বিশিষ্ট বড়লোক ছিলেন। একজন সাহেবের নামের সঙ্গে নাম মিলিয়ে তিনি কার টাগোর কোম্পানি নামে একটা বড় ব্যবসা চালাতেন। তাদের কয়লার খনি ছিল, ব্যাঙ্ক ছিল - তা ছাড়া জমিদারি ত ছিলই। এই সব থেকে যথেষ্ট আয় হত। দ্বারকানাথের আয় যেমন ছিল বেশি, তার খরচও ছিল তেমনি বেশি। সৎকাজে তিনি অকাতরে দান করতেন। শুধু তাই নয় –সে সময়ে বাংলা দেশের প্রায় সব ভাল কাজেই তিনি রাজা রামমোহন রায়ের প্রধান সহায়ক ছিলেন। বিলাতও গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি নাকি মাসে একলক্ষ টাকা খরচ করতেন। তার এই বড়মানুষির জন্য সকলে তাঁকে প্রিন্স্ বলত। এ গেল বড়লোক অর্থাৎ টাকা পয়সা, ধন দৌলত, পার্থিব সম্পদ ও ঐশ্বর্যে প্রতিষ্ঠাবান লোকের কথা। তার পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন আধ্যাত্মিক সম্পদে অর্থাৎ ধর্মসাধনায় বড়। সেই জন্য লোক তার নাম দিয়েছিল মহর্ষি অর্থাৎ মহা ঋষি। শুধু তাই নয়, তার চরিত্রে এমন একটা সততা, দৃঢ়তা ও উদারতা ছিল, যার জন্য চিরকাল তিনি দেশের লোকের শ্রদ্ধা লাভ করেছেন এবং এখনও করেন। তার সততার গল্পটা প্রত্যেক ছেলে মেয়ের জানা উচিত বলে তোমাদের বলছি।

প্রিন্স দ্বারকানাথ বিলাতে যখন মারা গেলেন তখন দেবেন্দ্রনাথ ঊনত্রিশ-ত্রিশ বছরের যুবক। তার আগে থেকেই তিনি বেদ, উপনিষদ্ তন্ত্র প্রভৃতি নানা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে দেশের লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সভা প্রতিষ্ঠা, পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়কর্মও দেখতেন। পিতার মৃত্যুর পর যখন কোম্পানির হিসাব-নিকাশ করা হল, তখন দেখা গেল যে তাঁদের কার-

টাগোর কোম্পানির গচ্ছিত মূলধন থেকে দেনা অনেক বেশি। দেনা প্রায় এক কোটি টাকা, কিন্তু মূলধন মাত্র সত্তরলক্ষ টাকা। ত্রিশলক্ষ টাকা কম। পাওনাদারেরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। তারা ভাবল তাদের টাকা বুঝি মারা গেল। কিন্তু তারা তো জানে না দেবেন্দ্রনাথ কি ধরনের মানুষ। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তারা তাঁর আসল পরিচয় পেল এবং ত্রিশ বছরের যুবকের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে তাদের মন অবনত হল। কেন তাই বলি—

প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ছিলেন পাকা বিষয়ী লোক। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ব্যবসা বন্ধ হলেও যাতে দেনার দায়ে তাঁর পুত্র পরিবার পরিজনের কোনও মুশকিলে পড়তে না হয়, সেজন্য তাঁর বিষয়সম্পত্তির একটা মোটা অংশ ট্রাস্ট্ সম্পত্তি করে রেখে ছিলেন, তার উপর কোনও পাওনাদারের কোনও অধিকার ছিল না। অর্থাৎ কোনও পাওনাদার সেই সম্পত্তি বিক্রি করে তাদের টাকা উসুল করে নিতে পারত না; পিতার মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ অনায়াসে বলতে পারতেন:

আমরা দেউলিয়া হয়ে গেছি, আমাদের ব্যবসা ফেল মেরেছে. আমরা দেনা শোধ করতে পারব না।

এ কথা তিনি যদি আদালতে হলফ করে বলতেন, তাহলে কেউ তাঁর ট্রাস্ট্ সম্পত্তিতে হাত দিতে পারত না। ঐ সম্পত্তির মালিক হয়ে দেবেন্দ্রনাথ রাজার হালে জীবন যাপন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তো সে ধরনের মানুষ ছিলেন না—সাধারণতঃ এ সব ক্ষেত্রে লোকে যা করে, তিনিও যদি তাই করতেন, তাহলে তিনি মহর্ষি-নামে লোকের শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করতে পারতেন না—আর আজ আমরাও তাঁর সম্বন্ধে এত কথা তোমাদের বলতাম না। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ভাই গিরীন্দ্রনাথকে বললেন:

যতক্ষণ আমার গায়ে সামান্য কাপড়টুকু পর্যন্ত আছে, ততক্ষণ

আমি কেমন করে ধর্মসাক্ষী করে বলি : আমাদের কিছু নেই—
আমরা দেউলিয়া।

তিনি পাওনাদারদের এক সভায় ডাকলেন। সেই সভায় দাঁড়িয়ে সকল পাওনাদার ও কারবারের কর্মচারীদের অবাক্ করে দিয়ে দেবেন্দ্রনাথ বললেন :

যে-ট্রাষ্ট্ সম্পত্তির উপর আপনাদের কোনও অধিকার নেই, সেই সম্পত্তি আমি আপনাদের হাতে সমর্পণ করছি, আপনারা এ সব বিক্রয় করে আপনাদের ধার শোধ করে নিন।

তাঁর এই সততা দেখে পাওনাদারদের মধ্যে অনেকে চোখের জল সাম্লাতে পারেন নি। পাওনাদারগণ তাঁকেই সমস্ত সম্পত্তির পরিচালক নিযুক্ত করে একটা মাসোহারার বন্দোবস্ত করে দিলেন। অনেক বছর ধরে দেবেন্দ্রনাথ পিতৃঋণ শোধ করেছেন, এমন কি দ্বারকানাথের কোনও এক সৎকাজে একলক্ষ টাকা দান করার কথা ছিল, সেই টাকা সুদসমেত দেবেন্দ্রনাথ অনেক বছর পরে শোধ করে দিয়েছিলেন।

পিতার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতি বইয়ে অনেক কিছু লিখেছেন। পিতার চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, ধর্মজীবন, প্রভৃতি কী ভাবে রবীন্দ্রনাথকে ছোটবেলা থেকে অভিভূত ও আকৃষ্ট করেছিল তা তাঁর রচনার অনেক স্থানে বিশেষ পরিস্ফুট আছে। তোমাদের মধ্যে অনেকে হয়ত জীবনস্মৃতি পড়েছ, যারা পড়নি, বড় হয়ে অবশ্যই পড়ে দেখো। এমন প্রাঞ্জল সুললিত ভাষা ও অপূর্ব বর্ণনা অন্য কোনও বাংলা বইয়ে আছে কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা-নামে বই অনেকে নিশ্চয়ই পড়েছ। তার ভাষা ও লেখার ছাঁদ অতুলনীয়। এ থেকে জানতে পারবে একশো বছর আগে কলকাতার অবস্থা কেমন ছিল এবং ধনী বনেদী ঘরের ছেলে হয়েও তিনি কী ভাবে মানুষ হয়েছিলেন।

ছোটবেলা তাঁর কেটেছিল চাকরবাকরদের কড়া শাসনের মধ্যে। তিনি বড় ভালমানুষ ছিলেন—চাকররা যা বলত ভয়ে ভয়ে তাই করতেন। বাইরে যাওয়া মানা ছিল। নিজের মনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গণ্ডিকাটা ছোট জায়গার মধ্যে কাটাতেন। রূপকথার গল্প, রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শিশুমনে কল্পনার জাল বুনত। বাড়ির পিছনের বাগান, পুকুর, পুরানো বটগাছ প্রভৃতির দিকে চেয়ে চেয়ে কল্পনাপ্রবণ শিশু নিজের মনে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয়ের অভাব নিজের মনের কল্পনা দিয়ে ভরিয়ে তুলতেন।

অক্ষর পরিচয়ের পর জল পড়ে পাতা নড়ে—এই কটি কথা তাঁর মনে কবিত্বের এক অপরূপ স্বাদ এনে দিল। তিনি লিখেছেন :

> আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা। সে দিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি কবিতার মধ্যে মিল জিনিষটার এত প্রয়োজন কেন। । জীবনস্মৃতি

ছোট বয়সের অনেক কথা বড় বয়সে তিনি কবিতায় গেঁথে রেখে গেছেন, সে-সব থেকে তাঁর ছেলেবেলার আশেপাশের সুন্দর ছবি পাওয়া যায় তারই কিছুটা তোমাদের জন্যে নিচে তুলে দিই, তোমরা পড়ে নিশ্চয়ই আনন্দ পাবে :

> বয়স তখন ছিল কাঁচা, হালকা দেহ খানা
> ছিল পাখির মতো, শুধু ছিল না তার ডানা।
> উড়ত পাশের ছাদের থেকে পায়রা গুলোর ঝাঁক,
> বারান্দাটার রেলিংপরে ডাকত এসে কাক।
> ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত গলির ওপার থেকে,
> তপসি মাছের ঝুড়িখানা গামছা দিয়ে ঢেকে।

বেহালাটা হেলিয়ে কাঁধে ছাদের পরে দাদা,
সন্ধ্যাতারার সুরে যেন সুর হোত তার সাধা।
জুটেছি বৌদিদির কাছে ইংরেজি পাঠ ছেড়ে,
মুখখানিতে ঘের দেওয়া তার শাড়িটি লাল পেড়ে।
চুরি করে চাবির গোছা লুকিয়ে ফুলের টবে
স্নেহের রাগে রাগিয়ে দিতেম নানান উপদ্রবে।
কিশোরী চাটুজ্জে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হোলে,
বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।
দ্রুত লয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া,
থাকত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাকত পড়া,
মনে মনে ইচ্ছা হোত যদিই কোনো ছলে
ভরতি হওয়া সহজ হোত এই পাঁচালির দলে,
ভাবনা মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে ওঠার দায়ে,
গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গাঁয়ে। [ছেলেবেলা

ছোট বেলায় রবীন্দ্রনাথের পড়াশুনা বাড়িতেই শুরু হয়েছিল যেমন সব ছেলেমেয়েদের হয়ে থাকে। স্কুলেও যেতেন বটে কিন্তু তাঁর শিশুমন প্রথম থেকেই স্কুলের উপর বিরূপ হয়েছিল---স্কুল কোনও দিন তাঁর ভাল লাগেনি, জীবনস্মৃতিতে স্কুলের কথা অনেক আছে। তার থেকে একটুখানি তুলে দিই। একটা স্কুল সম্বন্ধে লিখেছেন:

এই ইস্কুলে উৎপাত কিছুই ছিল না, তবু হাজার হইলেও ইহা ইস্কুল। ইহার ঘরগুলা নির্মম, ইহার দেওয়ালগুলো পাহারাওয়ালার মত, ইহার মধ্যে বাড়ির ভাব কিছুই নাই -- ইহা খোপওয়ালা একটা বড় বাক্স। কোথাও কোনও সজ্জা নাই, ছবি নাই, রং নাই, ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার লেশমাত্র চেষ্টা নাই। ছেলেদের যে ভাল মন্দ লাগা বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিষ আছে

বিদ্যালয় হইতে সেই চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্বাসিত। সেই জন্য বিদ্যালয়ের দেউড়ি পার হইয়া তাহার সঙ্কীর্ণ আঙিনার মধ্যে পা দিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সমস্ত মন বিমর্ষ হইয়া যাইত—অতএব ইস্কুলের সঙ্গে আমার সেই পালাইবার সম্পর্ক আর ঘুচিল না। [জীবনস্মৃতি

স্কুলের পড়াশুনা ভাল লাগত না, স্কুল থেকে পালাতেন বটে, কিন্তু তাই বলে পড়াশুনা করতেন না তা ভেবো না। ঐ অল্প বয়সে তিনি নিজের ইচ্ছায় ও গৃহশিক্ষকদের কাছে যত বিভিন্ন বিষয়ের পড়াশুনা করেছেন, তা স্কুলে-পড়িয়ে খুব কম ছেলেই করে থাকে। খানকতক পাঠ্যপুস্তক পড়ে কখনও সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি, হাতের কাছে যখন যে-বই পেয়েছেন, বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত যে-কোনো বই, ভাল করে বুঝুন বা না-বুঝুন পড়েছেন, যতটুকু রস গ্রহণ করতে পেরেছেন, তাতেই খুসি হয়েছেন। তা ছাড়া সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কত রকম বিষয় পড়াবার বন্দোবস্ত ছিল তা জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা পড়লে বেশ জানা যায়। জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা থেকে একটু খানি করে তুলে দিই।

অন্ধকার থাকতেই বিছানা থেকে উঠি। কুস্তির সাজ করি, শীতের দিনে শিরশির করে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে থাকে। শহরে এক ডাকসাইটে পালোয়ান ছিল, কানা পালোয়ান, সে আমাদের কুস্তি লড়াত।...এক হাত আন্দাজ খুঁড়ে মাটি আলগা করে তাতে এক মণ সরষের তেল ঢেলে জমি তৈরি হয়েছিল। সেখানে পালোয়ানের সঙ্গে আমার প্যাঁচকষা ছিল ছেলেখেলা মাত্র। খুব খানিকটা মাটি মাখামাখি করে শেষ কালে গায়ে একটা জামা চড়িয়ে চলে আসতুম। কুস্তির আখড়া থেকে ফিরে এসে দেখি মেডিকাল কলেজের এক ছাত্র বসে আছেন মানুষের হাড় চেনাবার বিদ্যে শেখাবার জন্য।..দেউড়িতে বাজল সাতটা।

নীলকমল মাষ্টারের ঘড়িধরা সময় ছিল নিরেট। এক মিনিটের তফাত হবার জো ছিল না।·· বই নিয়ে শ্লেট নিয়ে যেতুম টেবিলের সামনে। কালো বোর্ডের উপর খড়ি দিয়ে অঙ্কের দাগ পড়তে থাকত, সবই বাংলায়, পাটিগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত। সাহিত্যে সীতার বনবাস থেকে একদম চড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল মেঘনাদবধকাব্যে। [ছেলেবেলা

স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলেই ড্রয়িং এবং জিম্‌নাষ্টিকের মাষ্টার আমাদিগকে লইয়া পড়িতেন। সন্ধ্যার সময় ইংরাজি পড়াইবার জন্য অঘোরবাবু আসিতেন। এইরূপে রাত্রি নটার পর ছুটি পাইতাম।

রবিবার সকালে বিষ্ণুর কাছে গান শিখিতে হইত। তা ছাড়া প্রায় মাঝে মাঝে সীতানাথ দত্ত আসিয়া যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রাকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এই শিক্ষাটি আমার কাছে বিশেষ ঔৎসুক্য-জনক ছিল।·· ইহারি মাঝে এক সময়ে হেরম্ব তত্ত্বরত্ন মহাশয় আমাদিগকে একেবারে মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং হইতে আরম্ভ করিয়া মুগ্ধবোধের সূত্র মুখস্থ করাইতে সুরু করাইয়া দিলেন। [জীবনস্মৃতি

এ সব গেল তাঁর মাষ্টার মশায়দের কাছে নানা বিষয় পড়া। এ ছাড়া নিজের ইচ্ছায় কত যে পড়তেন এবং কেমন করে পড়তেন তারও কিছু আভাস দিলে তোমরা বুঝতে পারবে তিনি স্কুল থেকে পালিয়েও কি করে এত লেখা পড়া শিখলেন এত শক্ত শক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। খুব ছোট বয়স থেকে তাঁর বই পড়ার অভ্যাস ছিল। বাংলা বেশ ভাল করেই শিখেছিলেন কারণ যত বাংলা বই হাতের কাছে পেতেন সে সব তিনি পড়ে ফেলতেন। যে-টুকু সংস্কৃত বা ইংরেজি শিখেছিলেন সেই বিদ্যা নিয়ে ইংরেজি ও সংস্কৃত বই পড়তেও ছাড়তেন না। এই সব পড়া তাঁর কী রকম ছিল, জীবনস্মৃতি থেকে কিছু তুলে দিলে বুঝতে পারবে।

ছেলেবেলায় যখন ইংরাজি আমি প্রায় কিছু জানিতাম না তখন প্রচুর ছবিওয়ালা একখানি Old Curiosity Shop লইয়া আগাগোড়া পড়িয়াছিলাম। পনেরো আনা কথাই বুঝিতে পারি নাই। নিতান্ত আবছায়া গোছের কী একটা মনের মধ্যে তৈরি করিয়া সেই আপন মনের নানা রঙের ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থি বাঁধিয়া তাহাতেই ছবিগুলো গাঁথিয়াছিলাম,—পরীক্ষকের হাতে যদি পড়িতাম তবে মস্ত একটা শূন্য পাইতাম সন্দেহ নাই—কিন্তু আমার পক্ষে সে পড়া তত বড় শূন্য হয় নাই।

একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াইবার সময় তাঁহার বইগুলির মধ্যে একখানি অতি পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ামের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা, ছন্দ অনুসারে তাহার পদের ভাগ ছিল না; গদ্যের মত এক লাইনের সঙ্গে আর এক লাইন অবিচ্ছেদে জড়িত। আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভাল জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীতগোবিন্দ খানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে জিনিষটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে। গদ্য রীতিতে সেই বইখানি ছাপানো ছিল বলিয়া জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত সেইটেই আমার বড় আনন্দের কাজ ছিল। [জীবনস্মৃতি

তাঁর এই অধ্যবসায় ও চেষ্টা ছিল বলেই তিনি স্কুল থেকে পালিয়েও ভাল করে লেখা পড়া শিখেছিলেন।

একটু বড় বয়সে তিনি কী রকম পরিশ্রম করে নিজের চেষ্টায় পড়াশুনা করতেন তা নীচের এই অংশটুকু থেকে বুঝতে পারবে :

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ সে সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল।...বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোনো দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোট বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম। ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও আমার বুদ্ধি অনুসারে যথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিলাম। [জীবনস্মৃতি

এ রকম করে তোমরা কি কোনও নতুন বিষয় আয়ত্ত করবার চেষ্টা কর? রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন বলেই তিনি অত বড় লেখক ও কবি হয়েছিলেন তা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পার।

শিক্ষকদের কাছে নানা বিষয়ের বিদ্যাচর্চা, সঙ্গে নিজের ঐকান্তিক চেষ্টা ও অধ্যবসায় এবং তার উপরে ছিল তাঁদের বাড়ির আবহাওয়া। তাঁর দাদারা ও তাঁদের আত্মীয় বন্ধুরা নানা রকম পড়াশুনা, গান বাজনা আলাপ আলোচনা নিয়ে সর্বদা মশগুল থাকতেন। তাঁদের এই সব উঁচুদরের সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা চর্চার আভাস বালক রবীন্দ্রনাথের তরুণ মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি লিখেছেন :

অল্প বয়সে আমি আর একটি জিনিষ পেয়েছি। মানুষের থেকে দূরে বাস করলেও এবং উন্মুক্ত প্রকৃতির কোল থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কাটিয়ে থাকলেও আমি বাড়িতে আত্মীয় বন্ধুদের সংগীত সাহিত্য শিল্পকলা চর্চার আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েছি। এটি আমার জীবনের খুব বড়ো কথা। আমি শিশুকাল থেকে

পলাতক ছাত্র। মাষ্টারকে বরাবর ভয় করে এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু বিশ্বসংসারের যে সকল অদৃশ্য মাষ্টার অলক্ষ্যে থেকে পাঠ শিখিয়ে দেন তাঁদের কাছে কোনোরকমে আমি পড়া শিখে নিয়েছি। আমাদের বাড়িতে নিয়ত ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের ও সংগীতের আলোচনা হত, আমি এ সবের মধ্যে বেড়ে উঠেছি। এই সকল বিদ্যা যথার্থ ভাবে শিক্ষা না করলেও এ থেকে ভিতরে ভিতরে আশপাশ হতে নানা উপায়ে মনে মনে আনন্দরস সঞ্চয় করতে পেরেছি। আমার বড়দাদা তখন স্বপ্নপ্রয়াণ লিখতে নিরত ছিলেন। বনস্পতি যেমন স্বচ্ছন্দে প্রচুর ফুল ফুটিয়ে ফল ধরিয়ে ইতস্তত বিস্তর খসিয়ে ঝরিয়ে ফেলে দেয়, তাতে তার কোনো অনুশোচনা নেই; তেমনি তিনি খাতায় যতটি লেখা রক্ষা করতেন তার চেয়ে ছেড়া কাগজে বাতাসে ছড়াছড়ি যেত অনেক বেশি। আমাদের চলাফেরার রাস্তা সেইসব বিক্ষিপ্ত ছিন্নপত্রে আকীর্ণ হয়ে গেছে। সেই সকল অবারিত সাহিত্যরচনার ছিন্নপত্রের স্তূপ আমার চিত্তধারায় পলিমাটির সঞ্চয় রেখে দিয়ে গিয়েছিল। [বিশ্বভারতী

তিনি আরও লিখেছেন--

আমার নিতান্ত শিশুকালে মুলাজোরে গঙ্গার ধারের বাগানে মেঘোদয়ে বড়দাদা ছাদের উপরে একদিন মেঘদূত আওড়াইতেছিলেন তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায়ও ছিল না—তাঁহার আনন্দ-আবেগপূর্ণ ছন্দ উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। [জীবনস্মৃতি

এইরূপে বাড়ির আবহাওয়ার নানা প্রভাব তাঁর শৈশবের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ছিল।

খুব অল্প বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে পারতেন।

তাঁর বয়স যখন তেরো চৌদ্দ তখন তিনি নিজের লেখা প্রকাণ্ড একটা কবিতা হিন্দুমেলার অধিবেশনে প্রকাশ্যে আবৃত্তি করেন। আর ঐ কবিতাটা তাঁর নিজের নামে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই হল তাঁর স্ব-নামে প্রথম কবিতা প্রকাশ।

এই সময় থেকে স্কুলের পড়াশুনার চেয়ে নানারকম লেখার দিকে ঝোঁক বেশি পড়ে আরও সময় বেশি যেত। পরীক্ষায় পাশ করতে পারলেন না। বছর খানেকের মধ্যে স্কুলের পড়া শেষ হল। নিজের মনে পড়াশুনা করতেন—সব রকমের বই পড়তেন আর যা মনে আসত তাই লিখতেন। এই সময়ে তাঁর দাদাদের উদ্যোগে ভারতী-নামে মাসিক পত্রিকা বের হয়। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব লেখাই ছাপা হতে থাকল। সে সব লেখার কথা এখন বিশেষ কেউ জানে না। তবে এগুলি সব সংগৃহীত হয়ে তাঁর রচনাবলীতে ছাপা হয়েছে বটে, কিন্তু বড় বয়সে রবীন্দ্রনাথ এসব লেখার কোনও মূল্য দেন নি।

আগেই বলেছি তিনি বৈষ্ণব পদাবলী পড়তে খুব ভালবাসতেন এবং খুব কষ্ট ও যত্ন করে অনেক পদাবলী তিনি পড়েছিলেন। এই সব পদাবলী যে-ভাষায় লেখা, তার নাম ছিল ব্রজবুলি—বাংলা এবং গ্রাম্য হিন্দি ভাষার সংমিশ্রণ বললেও চলে। এই ভাষা রবীন্দ্রনাথ এমন আয়ত্ত করেছিলেন যে ষোল বছর বয়সে ঐ ভাষায় অনেকগুলি কবিতা লিখে ফেললেন। তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন :

> একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরের এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম :
>
> গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে মৃদুল মধুর বংশীবাজে,
> বিসরি ত্রাস লোকলাজে সজনি আও আওলো।
>
> লিখিয়া খুসি হইলাম।…

এইভাবে অনেকগুলি কবিতা লেখা হল, তার নাম দিলেন ভানুসিংহ ঠাকুরের কবিতা। পত্রিকায় ছাপা হলে অনেক পাঠক এগুলিকে সত্যিই কোনও বৈষ্ণব পদকর্তার রচিত পদাবলী বলে মনে করেছিল—সেগুলি এতই সুন্দর।

বয়স যখন বছর সতের, তাঁকে বিলাত পাঠানো হল। এই সময়ের মধ্যেই তাঁর লেখা অনেক কবিতা, নানা গদ্য প্রবন্ধ, গল্প উপন্যাস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এমন কি কবিকাহিনী নামে একখানা কবিতার বই পর্যন্ত ছাপা হয়েছে।

বিলাতবাসের বিবরণ তাঁর য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র ও জীবনস্মৃতিতে আছে। বিলাতের সামান্য একজন মুটে ও একজন ভিখারীর সততার কথা জীবনস্মৃতি থেকে তুলে দিলে বুঝ্‌তে পারবে, সাধারণ গরীব লোকও কত সৎ ও ভালো হতে পারে।

> একবার শীতের সময় আমি টন্‌ব্রিজ্‌ ওয়েল্‌স্‌ সহরের রাস্তা দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম একজন লোক রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছে; তাহার ছেঁড়া জুতার ভিতর দিয়া পা দেখা যাইতেছে, পায়ে মোজা নাই, বুকের খানিকটা খোলা। ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ বলিয়া সে আমাকে কোনো কথা বলিল না, কেবল মুহূর্তকালের জন্য আমার মুখের দিকে তাকাইল। আমি তাহাকে যে মুদ্রা দিলাম তাহা তাহার পক্ষে প্রত্যাশার অতীত ছিল। আমি কিছুদূর চলিয়া আসিলে সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কহিল, মহাশয় আপনি আমাকে ভ্রমক্রমে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছেন, বলিয়া সেই মুদ্রাটি আমাকে ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইল। এই ঘটনাটি হয় ত আমার মনে থাকিত না কিন্তু ইহার অনুরূপ আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। বোধকরি টর্কি স্টেশনে প্রথম যখন পৌঁছিলাম একজন মুটে আমার মোট লইয়া ঠিকাগাড়িতে তুলিয়া দিল।

টাকার থলি খুলিয়া পেনিজাতীয় কিছু পাইলাম না, একটি অর্দ্ধক্রাউন ছিল সেইটিই তাহার হাতে দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি সেই মুটে গাড়ির পিছনে ছুটিতে ছুটিতে গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাইতে বলিতেছে। আমি মনে ভাবিলাম, সে আমাকে নির্বোধ বিদেশী ঠাওরাইয়া আরো কিছু দাবী করিতে আসিতেছে। গাড়ি থামিলে সে আমাকে বলিল, আপনি বোধ করি, পেনি মনে করিয়া আমাকে অর্দ্ধক্রাউন দিয়াছেন।

আমাদের দেশে ক'টা লোক এরকম করতে পারে?

বিলাত পাঠানো হয়েছিল ব্যারিস্টার হবেন বলে। কিন্তু তা হওয়া হলনা। বছর দেড় পরে দেশে ফিরে এলেন। কী ভাগ্যিস তাঁর ব্যারিস্টার হওয়া হয় নি! তাহলে তিনি কি এত অজস্র কবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ লেখবার সময় পেতেন?

বিলাত থেকে ফিরে আসার পর তাঁর গান তৈরির হাতেখড়ি হল বললেও চলে। অবশ্য এর আগে দু'চারটা গান যে না লিখেছিলেন এমন নয় কিন্তু আসলে নতুন নতুন সুরে গান লেখার পালা সুরু হল এবার। তিনি লিখেছেন:

এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা। জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গিতে ঝমাঝম সুর তৈরি করতেন, আমাকে রাখতেন পাশে। তখনি তখনি সেই ছুটে চলা সুরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার। [ছেলেবেলা

এমনি করে সৃষ্টি হল বিচিত্র সুরের গানে ভর্তি বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া-নামে দুটি গীতিনাট্য। শুধু গীতিনাট্য লিখেই ক্ষান্ত হলেন না, নিজে সে-দুটিতে অভিনয় পর্যন্ত করলেন। সেই কুড়িবছর বয়সের লেখা বাল্মীকি-প্রতিভার কথা তোমরা জান, এখনও অভিনয় করে থাক।

'এরপর থেকে চলল তাঁর কবিতা লেখার পালা।' শুধু কবিতা কেন বলি, পদ্য গদ্যের জুড়িগাড়ি বললেও চলে। হু হু করে নানা লেখা প্রকাশিত হতে লাগল। কবিতার বই বের হল, নাম তার সন্ধ্যা সংগীত। এই কবিতাগুলি কী রকম সমাদৃত হয়েছিল তার কথাটা বলি। বাংলা সাহিত্যের অমর ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম তোমরা নিশ্চয়ই জান। এমন কি তাঁর লেখা আনন্দমঠ তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত পড়েছ। বন্দেমাতরম্ গানটি ঐ উপন্যাসের মধ্যে আছে। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন কুড়ি-একুশ, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও পরিচিত বিখ্যাত ব্যক্তি। ঐ সময়ে প্রকাশিত হল সন্ধ্যাসংগীত। এ ভাবের কবিতা এর আগে বিশেষ কেউ লেখে নি। ঐ সন্ধ্যাসংগীত পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার পরিচয় পেয়েছিলেন। জহুরী জহর চেনে। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে কী ভাবে পুরস্কৃত করেছিলেন সেই ঘটনাটা রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায় বলি।

> রমেশ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহসভার দ্বারের কাছে বঙ্কিম বাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন; রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুর গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন 'এ মালা ইহারই প্রাপ্য, রমেশ, তুমি সন্ধ্যাসংগীত পড়িয়াছ'? তিনি বলিলেন, 'না'। তখন বঙ্কিম বাবু সন্ধ্যাসংগীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম। [জীবনস্মৃতি

এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লেখা প্রভাতসংগীতের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ-কবিতাটি তোমাদের মধ্যে অনেকেই জান, হয়ত আবৃত্তিও করে থাক:

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান।
না জানি কেনরে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি
ওরে প্রাণের বেদনা প্রাণেব আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।

নির্ঝরের মত তিনিও তাঁর প্রাণের আবেগ রোধ করতে পারলেন না—কবিতার পর কবিতা আপনি নির্ঝরের ধারার মত ঝরঝর করে বের হয়ে আস্‌তে লাগল—সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাড়া নিজের প্রাণের মধ্যে পেলেন। লিখলেন:

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

তিনি তাঁব জীবনে নিখিল মানুষের স্পর্শানুভূতির জন্য ব্যগ্র। তাই লিখলেন।

মবিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।

তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে—বিশ্ববাসীর অন্তরে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত—তিনি অমর, তিনি অজর। তাই আমরা আজ তাঁকে স্মরণ করছি, তাঁর জন্মশতবার্ষিক উৎসব করছি এবং বর্ষে বর্ষে পঁচিশে বৈশাখে তাঁর জন্মতিথি পালন করে আসছি।

বিলাত থেকে ফিরে আসার পর দশ বছরে তিনি কত যে গদ্য ও পদ্য লিখেছেন তার হিসাব করা শক্ত। এই পর্বের কয়েকখানা বইয়ের নাম

করলে বুঝতে পারবে। বউঠাকুরাণীর হাট, রাজর্ষি, মুকুট, মায়ার খেলা, রাজা ও রাণী, বিসর্জন-প্রভৃতি অনেক বই এই সময়ে লেখা। শুধু বই লেখা নয়, সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ের কত বই যে পড়েছেন, তার ধারণা করা শক্ত। নানা জ্ঞান আহরণ না করলে লোকের কাছে দেবেন কী? তাই নানা জটিল বিষয়ের বইও সর্বদা পড়তেন। এর মধ্যে একবার মাস-তিনেকের জন্যে বিলাতও বেড়িয়ে এলেন।

এর পরেই তাঁর উপর পড়ল জমিদারি দেখাশোনার ভার। তখন তাঁর বয়স ঊনত্রিশ ত্রিশ হবে। উত্তর ও পূর্ববঙ্গের অনেক জায়গায় ঠাকুর পরিবারের জমিদারি ছিল—সে সবের তদারক করা সোজা কথা নয়। গ্রামে গ্রামে নদীতে নদীতে বছরের পর বছর কেটেছে। লিখেছেন:

তখন কেবলমাত্র কবিতা লিখে দিন কাটিয়েছি; অধ্যয়ন ও সাহিত্যালোচনার মধ্যে ডুবে ছিলাম, তারই সঙ্গে ছিল বিষয়-কর্মের বিপুল বোঝা।

তাঁর বিখ্যাত ছোট গল্পের অনেকগুলি এই সময়ে লেখা। প্রায় সবগুলিতে বাংলাদেশের নদী, পল্লী, ও মানুষের জীবনযাত্রা সুন্দর ফুটে উঠেছে। তোমরা নিশ্চয়ই অনেক গল্প পড়েছ যেমন · ছুটি, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, কাবুলিওয়ালা, গুপ্তধন, স্বর্ণমৃগ, অনধিকার প্রবেশ প্রভৃতি।

বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ও নদীতে নদীতে ঘুরতে ঘুরতে যে-সব ছবি তাঁর চোখে পড়েছে, সেগুলির সুন্দর বর্ণনা আছে সে সময়ে লেখা চিঠিগুলিতে। অনেকগুলি চিঠি ছিন্নপত্র নামে ছাপা হয়েছে। তার থেকে দু-একখানা চিঠির খানিকটা তুলে দিই—তোমাদের নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগবে।

কাছারির পরপারের নির্জন চরে বোট লাগিয়ে বেশ আরাম

বোধ হচ্চে। দিনটা এবং চারিদিকটা এমনি সুন্দর ঠেক্‌চে সে আর কি বলব। অনেকদিন পরে আবার এই বড় পৃথিবীটার সঙ্গে যেন দেখা-সাক্ষাত হল। সেও বল্লে এই যে! আমিও বল্লুম এই যে! তারপর দুজনে পাশাপাশি বসে আছি আর কোন কথাবার্তা নেই। জল ছল্‌ছল্‌ করছে এবং তার উপরে রোদ্দুর চিক্‌চিক্‌ করচে—বালির চর ধূ ধূ করচে, তার উপরে ছোট ছোট বনঝাউ উঠেছে। জলের শব্দ, দুপুরবেলাকার নিস্তব্ধতায় ঝাঁ ঝাঁ, এবং ঝাউঝোপ থেকে দুটো একটা পাখীর চিক্‌চিক্‌ শব্দ সবসুদ্ধ মিলে খুব একটা স্বপ্নাবিষ্ট ভাব। খুব লিখে যেতে ইচ্ছে করচে—কিন্তু আর কিছু নিয়ে নয়, এই জলের শব্দ, এই রোদ্দুরের দিন, এই বালির চর। মনে হচ্চে রোজই ঘুরে ফিরে এই কথাই লিখতে হবে; কেননা আমার এই একই নেশা; আমি বারবার এই কথাই নিয়ে বকি। বড় বড় নদী কাটিয়ে আমাদের বোটটা একটা ছোট নদীর মুখে প্রবেশ করচে। দুইধারে মেয়েরা স্নান করচে, কাপড় কাচচে, এবং ভিজে কাপড়ে একমাথা ঘোমটা টেনে জলের কলসী নিয়ে ডানহাত দুলিয়ে ঘরে চলেছে—ছেলেরা কাদা মেখে জল ছুঁড়ে মাতামাতি করচে—এবং একটা ছেলে বিনা সুরে গান গাইচে—একবার দাদা বলে ডাক্‌রে লক্ষ্মণ। উঁচু পাড়ের উপর দিয়ে অদূরবর্তী গ্রামের খড়ের চাল এবং বাঁশবনের ডগা দেখা যাচ্চে। আজ মেঘ কেটে গিয়ে রোদ্দুর দেখা দিয়েছে। যে মেঘগুলো আকাশের প্রান্তভাগে অবশিষ্ট আছে সেগুলো সাদা তুলোর রাশের মত দেখাচ্চে। বাতাস ঈষৎ গরম হয়ে বচ্ছে। ছোট নদীতে বড় বেশী নৌকো নেই; দুটো একটা ছোট ডিঙি শুকনো গাছের ডাল এবং কাঠকুটো বোঝাই নিয়ে ছপ্‌ছপ্‌ দাঁড় ফেলে চলেচে—ডাঙায় বাঁশের উপর জেলেদের জাল শুকোচ্চে—

পৃথিবীর সকালবেলাকার কাজকর্ম খানিকক্ষণের জন্যে বন্ধ হয়ে আছে।

আর একখানা চিঠির কিছু অংশ তুলে না দিয়ে পারছিনে :

······আমাদের সমস্ত কাজ সেরে সন্ধ্যার সময় নৌকা ছেড়ে দিলুম। আকাশে মেঘ ছিল না—চাঁদ উঠেছিল—অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছিল—ঝুপঝুপ দাঁড় ফেলে স্রোতের মুখে ছোট নদীটির মধ্যে ভেসে যাওয়া যাচ্ছিল। চারিদিক পরীস্থান বলে মনে হচ্ছিল। সে সময় অন্যান্য সমস্ত নৌকো ডাঙায় কাছি বেঁধে পাল গুটিয়ে চন্দ্রালোকে স্তব্ধ হয়ে নিদ্রা দিচ্ছিল। অবশেষে ছোট নদীটা যেখানে যমুনার মধ্যে গিয়ে পড়েছে তারি কাছে খুব একটা নিরাপদ স্থানে গিয়ে নৌকো বাঁধলে। কিন্তু নিরাপদ স্থানের অনেক দোষ ; হাওয়া পাওয়া যায় না—ঝুপ্সিব ভিতরে, অন্যান্য নৌকোর কাছে, জঙ্গলের গন্ধ ইত্যাদি। আমি মাঝিকে বললুম—এপারে হাওয়া পাওয়া যাবে না, ওপারে চল্। ওপারে উঁচু পাড় নেই ; জলে স্থলে সমান—এমন কি ধানের ক্ষেতেব উপর এক হাঁটু জল উঠেচে। মাঝি সেইখানেই নৌকো নিয়ে বাঁধলে। তখন আমাদের পিছন দিকেব আকাশে একটু বিদ্যুৎ চিক্‌মিক্ করতে আরম্ভ করেচে। আমি বিছানায় ঢুকে জান্‌লার কাছে মুখ রেখে ক্ষেতের দিকে চেয়ে আছি এমন সময় রব উঠল—ঝড় আস্‌চে। কাছি ফেল্, নোঙর ফেল্, এ কর্, সে কর, করতে করতে এক প্রলয় ঝড় ছুটে এল। মাঝি থেকে থেকে বলতে লাগল—ভয় কোরো না ভাই, আল্লার নাম কর আল্লা মালেক। থেকে থেকে সকলে আল্লা আল্লা করতে লাগল।···আমাদের বোটটা যেন শিকল বাঁধা পাখীর মত পাখা ঝাপটে ঝট্‌পট্ ঝট্‌পট্ করছিল—ঝড়টা থেকে থেকে চাঁহি চাঁহি শব্দ করে একটা বিপর্যয় চিলের মত হঠাৎ

এসে পড়ে বোটের খুঁটি ধরে ছোঁ মেরে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়—বোটটা অমনি সশব্দে ধড়ফড় করে ওঠে। অনেক বাদে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে ঝড় থেমে গেল। হাওয়া খেতে চেয়েছিলুম—হাওয়াটা কিছু বেশি খাইয়ে দিলে—একেবারে আশাতিরিক্ত। যেন কে ঠাট্টা করে বলে যাচ্ছিল—এইবার পেট ভরে হাওয়া খেয়ে নাও, তার পরে সাধ মিটলে কিঞ্চিৎ জল খাওয়াব—তাতে এমনি পেট ভরবে যে ভবিষ্যতে আর কিছু খেতে হবে না।

এ-সব চিঠি যখন লিখেছেন, তখন তাঁর বয়স ত্রিশ-একত্রিশ হবে। শিলাইদহ, পতিসর, সাহাজাদপুর প্রভৃতি গ্রামে গ্রামে নৌকো করে ঘুরে বেড়াতেন, নৌকোতেই বেশীর ভাগ সময় কাটাতেন। নৌকোই ছিল তাঁর ঘর বাড়ি।

এই সময়ের একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করব—তার থেকেই বুঝবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রজাদের কী সম্বন্ধ ছিল আর লোকে তাঁকে কি রকম বিশ্বাস করত।

জমিদারী পরিচালনা করতে তিনি তাঁর দুজন ভাইপোর সঙ্গে একযোগে পাটের ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন। এ ব্যবসা চালাবার জন্যে কুষ্টিয়ার একজন ধনী প্রজার কাছ থেকে একলক্ষ টাকা রবীন্দ্রনাথ ধার নিয়েছিলেন। প্রজাটি তাদের তরুণ জমিদারকে এতই বিশ্বাস করত যে কোনও দলিলপত্র না করে কেবল মুখের কথায় লাখটাকা বার করে দিয়েছিল।

বেশ কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ কুষ্টিয়ায় গেলে প্রজাটি তাঁকে মনে করিয়ে দিল যে আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে টাকাটা শোধ না হলে তামাদি হয়ে যাবে। তখন রবীন্দ্রনাথ হেসে তাকে বললেন :

ভদ্রলোক যে-টাকা ধার নেয়, সে কি কখনও তামাদি হতে পারে? তুমি নিশ্চিন্ত থাক বেণী, টাকা ঠিক সময়েই পাবে।

সত্যি তাই—তামাদি হবার শেষ তারিখের কয়েকদিন আগে রবীন্দ্রনাথ সব টাকা শোধ করে দিলেন। আজকালকার দিনে এরকম ঘটনা উপকথা বলে মনে হয়, কিন্তু ভুলে যেওনা রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র!

বলা বাহুল্য ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত এই দশ বছরের মধ্যে তিনি অজস্র কবিতা, গান, নাটক, গল্প উপন্যাস প্রভৃতি লিখেছেন— সে-সব সম্বন্ধে সবিশেষ কিছুই বলা যাবে না। শুধু একটা কথা তোমাদের মনে রাখা দরকার যে রবীন্দ্রনাথ শুধুই কেবল কবিতা, গান, গল্প নাটক উপন্যাস লেখেননি, দেশের নানা সমস্যা নিয়ে তিনি অসংখ্য প্রবন্ধও লিখেছেন। সে-সব প্রবন্ধে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ইংরেজ সরকারের নানা নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ তাঁর প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে। যেখানে কোনও অন্যায়, অবিচার দেখেছেন সেখানে তিনি চুপ করে থাকতে পারেন নি—নির্দয়ভাবে লেখনী চালনা করেছেন। এ-সব প্রবন্ধ তোমরা বড় হয়ে অবশ্যই পড়ে দেখবে সে কথা বলা বাহুল্য।

চল্লিশ বছর বয়সে তিনি তোমাদের মত ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে স্কুল করেছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে থেকে তাদের কথাই ভেবে কাটিয়ে দিয়েছেন। ছেলেদের জন্যে স্কুল কেন করেছিলেন, তাঁর কী উদ্দেশ্য ছিল সে সম্বন্ধে তিনি অনেক কিছু লিখে গেছেন। বড় হয়ে সে-সব কথা তোমরা পড়বে। এখন কয়েকটা কথা বলি যার থেকে তোমরা মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারবে।

আগেই বলেছি ছোটবেলাকার স্কুলের দুঃখ তার মনে ছিল, সেইজন্য বড় বয়সে তিনি এমন জায়গায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করলেন

যেখানে ছেলেরা মনের আনন্দে পড়াশুনা করতে পারবে—উন্মুক্ত আকাশের তলায়, খোলা মাঠের মাঝে, বড় বড় গাছের ছায়ায়, বিশ্ব-প্রকৃতির নিবিড় সংস্পর্শে। বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব সম্বন্ধে একটা চিঠি থেকে কিছু তুলে দিলে ভাল করে বুঝতে পারবে।

> আমাদের বিদ্যালয়ের এই একটি বিশেষত্ব আছে যে, বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে অখণ্ডযোগে আমাদের ছেলেদের মানুষ করতে চাই—কতকগুলি বিশেষ শক্তির উগ্র বিকাশ নয়, কিন্তু চারিদিকের সঙ্গে চিত্তের মিলনের দ্বারা প্রকৃতির পূর্ণতা সাধন আমাদের উদ্দেশ্য। ......আমাদের ছেলেরা বৃষ্টিতে ঘুরে বেড়ায়, জ্যোৎস্না রাত্রিতে আনন্দ উপভোগ করে, তারা রৌদ্রকে ডরায় না, তারা গাছে চড়ে বসে পড়া করে—এ গুলোকে আমি সামান্য জিনিষ বলে মনে করিনে।

তিনি মনে করতেন এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের একটি স্নেহের সম্বন্ধ এবং প্রাণের যোগ থাকা একান্ত আবশ্যক। শিক্ষক কেবল মাত্র বিদ্যাশিক্ষা দেবার যন্ত্র নন, তিনি মানুষ, তাঁর হৃদয় আছে, স্নেহ আছে, তিনি ছাত্রদের হৃদয় জয় করতে পারেন — ছাত্রশিক্ষকের এই আদর্শ সম্বন্ধের কথা রবীন্দ্রনাথের মনে বরাবর ছিল। তাই তিনি এক জায়গায় লিখেছেন :

> এই আশ্রমে আমি একটি সম্পূর্ণ জীবনের আদর্শ গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম—ছাত্র এবং অধ্যাপক মিলে একটি সমগ্র সত্তা সৃষ্টি করে তুলবেন এই আমার লক্ষ্য ছিল।...আনন্দের ভিতর দিয়ে, মুক্তির হাওয়ার মধ্যে শিশুচিত্ত যেমন বিকশিত হয়, তেমন আর কিছুতে হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে ফল পাওয়ার আশা অল্প। কাজেই যখন দেখলুম শিশুচিত্ত বিদ্যার নামে বন্দী হয়ে আছে, তখন মন ব্যাকুল হল; যাতে করে শিশুর দুঃখ

দূর হয়, অধ্যাপকের স্নেহে কল্যাণে অভিষিক্ত হয়ে মুক্ত সমীরণে শিক্ষা লাভ করতে পারে, এখানে তার ব্যবস্থা হল।

বলা বাহুল্য প্রথমে এটা ছিল সম্পূর্ণ আবাসিক বিদ্যালয়— বড় বড় ঘরে এক সঙ্গে একই অবস্থার মধ্যে শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের বাস। পরস্পরের সঙ্গ ও সহযোগিতায় তাদের দিন কাটে ; তাতে পরস্পরের সুখ দুঃখ সুবিধা অসুবিধার প্রতি পরস্পরকে সচেতন করে তোলবার প্রধান সুযোগ হয়। তার উপরে :

আপনার চারদিককে নিজের চেষ্টায় সুন্দর সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যকর করে তুলে একসঙ্গে বাসের দায়িত্বের অভ্যাসও বাল্যকাল থেকেই সহজ হয়ে ওঠে।

সেই জন্য দরকার ছেলেদের আত্মকর্তৃত্ব-বোধকে জাগরিত করা— এতে করে পরের উপর নির্ভরতা চলে যায়, নিজের উপর বিশ্বাস আসে, দায়িত্ব-বোধ জাগে। সেই জন্য ছাত্রদের পরিচালনার ভার সম্পূর্ণরূপে ছাত্রদের উপর তিনি দিয়েছিলেন। ভোরে শয্যাত্যাগের পর থেকে আরম্ভ করে রাত্রে শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত সব কাজে ছাত্ররা নিজেরাই নিজেদের পরিচালনা করবে এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে নিয়ম কানুন তৈরি করা ও সে সব নিয়ম পালন করার ভার তাদের নিজেদের। যদি কোথাও কোনও শৈথিল্য দেখা যায় তা দূর করবার ভারও ছাত্রদের নিজেদের হাতে।

আত্মকর্তৃত্বের সঙ্গে যাতে ছাত্রদের আত্মসম্মানবোধ জাগে তার জন্য রবীন্দ্রনাথের সজাগ দৃষ্টি ছিল। তাঁর ধারণা ছিল যাকে বিশ্বাস করা যায়, সে বিশ্বাস রাখে, কাউকে অবিশ্বাস করলে তার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ন হয়। তাই বিদ্যালয়ের কোনও পরীক্ষায় পাহারা দেবার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়ে ছেলেরা যেখানে খুসি বসে উত্তর লিখে সময় মত এনে দিলেই হল। এই বিশ্বাস ছাত্রগণ

প্রাণপণ রাখতে চেষ্টা করত। যদি কখনও কোনও ছেলে দুর্বলতা বশত এ বিশ্বাস ভাঙত, তা হলে অন্যান্য ছাত্রদের কাছে সে বিশেষ ভাবে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হত। তার শাস্তি বিধান ছাত্ররা নিজেরাই করত এবং সে শাস্তি দোষীকে নির্বিবাদে গ্রহণ করতে হত।

আর একটা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ ছিল, সেটা হল আশ্রমের গাছপালা, পশুপাখী, লোকজন, নানা কাজকর্ম, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির প্রতি ছেলেদের ঔৎসুক্য ও মমত্ব যাতে জাগে, তার চেষ্টা। সেই জন্যে তিনি মনে করতেন ছেলেদের শিক্ষার বিশেষ অঙ্গ হওয়া উচিত প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ— পারিপার্শ্বিকের প্রতি ছেলেদের মন সর্বদা সজাগ ও সক্রিয় থাকবে এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন :

> আমাদের মানসপ্রকৃতিতে ঔৎসুক্যের অত্যন্ত অভাব। মানুষের প্রতি আমাদের ছেলেদের ঔৎসুক্য দুর্বল, গাছ পালা পশুপাখির প্রতিও।

এই সব-কিছু জানবার ইচ্ছার অভাবকে তিনি দূর করতে চেয়েছিলেন তাঁর বিদ্যালয়ে। তিনি লিখেছেন :

> প্রথম থেকে আমার সংকল্প ছিল, আমার আশ্রমের ছেলেরা চারিদিকের জগতের অব্যবহিত সম্পর্কে উৎসুক হয়ে থাকবে— সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে।

তিনি একটা চিঠিতে কোনও শিক্ষককে লিখেছিলেন :

> ছেলেদের মনকে চারিদিক থেকে উদ্বোধিত করে তোলো। তাদের চিন্তার জড়ত্ব মোচন করে দাও। এইটেই সবচেয়ে দরকার। আমাদের মন ছেলেবেলা থেকে কোনো খাদ্যই পায়না বলে চিরদিনের মত তাদের ক্ষুধা মরে যায়! আমাদের ছেলেদের

মন যেন উপবাসে অভ্যস্ত হয়ে না যায়। তারা কেবল কলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বেরুবে এইদিকেই তোমাদের অধিকাংশ চেষ্টা প্রয়োগ কোরো না। মনের ভিতর দিয়ে জীবনের ভিতর দিয়ে তারা জগৎটাকে গ্রহণ করতে পারে, এমন শক্তি এমন আনন্দ তাদের মনে সঞ্চারিত করে দাও।

সেই জন্য তিনি চেয়েছিলেন :

এমন সকল শিক্ষক যাঁদের দৃষ্টি বইয়ের সীমানা পেরিয়ে গেছে, যাঁরা চক্ষুষ্মান, যাঁরা সন্ধানী, যারা বিশ্ব-কুতূহলী, যাঁদের আনন্দ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে এবং সেই জ্ঞানের বিষয়-বিস্তারে যাদের প্রেরণাশক্তি সহযোগীমণ্ডল সৃষ্টি করে তুলতে পারে।

তাই তিনি মনে করতেন যাঁরা শিক্ষকতা করবেন, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রও হবেন—নিজের মনে কোনও একটা বিষয় নিয়ে পড়াশুনা ও আলোচনা করবেন, বই লিখবেন। তাই দেখা যায় আশ্রমের প্রথম দিককার অনেক শিক্ষকই নানা বিষয়ে বিশেষ পড়াশুনা করেছেন— বই লিখে জ্ঞানবিস্তারে সহায়তা করেছেন। এর মূল প্রেরণা তাঁরা পেয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে।

এই আদর্শেই হল বিশ্বভারতী পরের গবেষণা বিভাগের সূত্রপাত।

রবীন্দ্রনাথ খুব ভাল শিক্ষক ছিলেন। তাঁর শিক্ষাপ্রণালী তাঁর নিজের তৈরি ছিল। ছোট ছেলেদের হৃদয় কী করে হরণ করতে হয় তা তাঁর জানা ছিল। তিনি ছোটবেলা থেকে নিজের শিক্ষার ভার নিজের হাতে নিয়েছিলেন বলে তিনি জানতেন কী ভাবে কী জিনিষ পড়ালে ছাত্রদের মনকে সহজে পাওয়া যায়। সেইজন্য তাঁর ক্লাশে পড়বার জন্যে সকলের উৎসাহের অন্ত ছিলনা।

ইংরেজি, সংস্কৃত, প্রভৃতি ভাষা যারা প্রথম শিখবে, তাদের কী প্রণালীতে শেখাতে হবে সে সব উপায় তিনি উদ্‌ভাবন করেছিলেন

এবং সেগুলি কাজে খাটিয়ে বিশেষ ফল পেয়েছিলেন। ইংরেজি যারা প্রথম শিখ্‌তে শুরু করবে তাদের জন্য ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা, ইংরেজি সোপান-প্রভৃতি বই লিখেছিলেন। এমন কি সংস্কৃত শেখাবার নতুন প্রণালীতে সংস্কৃতশিক্ষাও লিখতে পিছ্‌পা হন নি। এ-সব গেল বিদ্যালয়ের গোড়ার দিককার কথা। বৃদ্ধ বয়সে তিনি শিশুদের বাংলা শেখার জন্যে সহজপাঠ লিখেছেন—তা তোমরা সবাই পড়েছ।

পুঁথি-পড়া বিদ্যার সঙ্গে মানুষ হওয়ার শিক্ষা যাতে হয় তার জন্য মহর্ষির সাধনা-বিজড়িত আশ্রমের আধ্যাত্মিক পরিবেশ ছিল সবচেয়ে উপযোগী। তার জন্য দরকার ছিল সকাল সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসা—তার পরে সমস্বরে উপনিষদের মন্ত্র আবৃত্তি। তাছাড়া এখানে যে-সকল গান ছেলেরা গায় ও শোনে তার কথা ও ভাব জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে, এ কথা সুনিশ্চিত। তার উপরে ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনের সঙ্গে যোগ। সে যোগ কেমন ছিল এবং তিনি ছাত্রদের কাছ থেকে কী আশা করেছিলেন, তা নিচের চিঠির অংশ থেকে তোমরা ভাল করে বুঝতে পারবে।

> নানা অবস্থা ও নানা ঘটনার মধ্যে আমি চিরদিন তোমাদের মঙ্গল কামনা করিয়া আসিয়াছি। অনেক সময়ে তোমাদিগকে আঘাত করিয়াছি এবং তোমাদের কাছ হইতে আঘাত পাইয়াছি কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আমার একটি স্নেহের বন্ধন আছে। তাহা ছিন্ন হইবার নহে। আমার সেই স্নেহ তোমাদের সঙ্গে রহিল। আমাদের এই সম্বন্ধ যে ব্যর্থ নহে, আমাদের এতদিনের সাধনা যে নিষ্ফল হয় নাই তোমাদের জীবনে তাহার পরিচয় দিতে হইবে—তোমাদের কাছ হইতে এই আমি গুরুদক্ষিণা চাই।……আজ দূরে যাইবার সময়ে আমি একান্তমনে তোমাদিগকে এই আশীর্বাদ করিয়া যাইতেছি যে, তোমরা আপনার সাধনায় আপনারা তেজস্বী

হইয়া ওঠ—আপনার অন্তরের মধ্যে প্রত্যক্ষরূপে নিকটতম করিয়া তাঁহাকে চাও যিনি তোমাদের অন্তর্যামী। সেই উপলব্ধির দ্বারা তোমরা কেবলি বড় হইয়া উঠিতে থাক; আপনার স্বার্থের উপরে বড় হও, সুখদুঃখের উপরে বড় হও, প্রবল প্রবৃত্তির উপরে বড় হও,—চারিদিকের সংকীর্ণ সংস্কারের উপরে বড় হও—সত্যের মধ্যে বড় হও, অম্লান আনন্দের মধ্যে বড় হও।—ব্রহ্ম শব্দের অর্থই বড়, যে-পরিমাণে বড় হইবে, সেই পরিমাণে তাঁহাকে পাইতে থাকিবে, যে-পরিমাণে তাঁহাকে পাইবে সেই পরিমাণেই তোমাদের জীবন কৃতকৃতার্থ হইয়া উঠিবে। এই তোমাদের মন্ত্র হউক—মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাম্ মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ— যিনি সকলের বড় তিনি আমাকে ত্যাগ করেন নাই—আমি যেন সকলের বড়কে ত্যাগ না করি।...

যখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করতে মনস্থ করলেন, তার অনেক আগে থেকেই তাঁর জন্য জায়গা প্রস্তুত ছিল—সে জায়গার নাম হল শান্তিনিকেতন আশ্রম। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন বারো বছর সে সময়ে তিনি তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বোলপুরে এসেছিলেন। তখন কে জানত বোলপুরের প্রান্তর হবে তাঁর জীবনের বিশ্ববিশ্রুত কর্মক্ষেত্র। শান্তিনিকেতন নাম কেন হল, এ নাম কে দিল, এসব কথা লোকে ভুলতে বসেছে, তাই সেই কথাটা তোমাদের বলি:

রবীন্দ্রনাথের জন্মের অনেক আগে থেকেই তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন কখনও হিমালয় পাহাড়, কখনও বা গঙ্গার বুকে। এই রকম বেড়াবার সময়ে একবার পালকি করে বোলপুরের কাছে রায়পুর গ্রামে সিংহদের বাড়ি তিনি যাচ্ছিলেন। সেখানে তাঁর বন্ধু শ্রীকণ্ঠ সিংহ থাকতেন। তিনি ছিলেন লর্ড সিংহের

জেঠামশায়। পথে পড়ল প্রকাণ্ড একটা মাঠ, উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো—ধূ ধূ করে যেদিক পানে চাই কোনোখানে জনমানব নাই···। কেবল তাল ও খেজুরের দু-চারটে সারি এদিক ওদিক। ঐ দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরের এক জায়গায় দেখলেন দুটি বিরাট ছাতিম গাছ রৌদ্রদগ্ধ পথিককে বুকের তলায় আশ্রয় দেবার জন্যে তাদের বিশাল শাখাপ্রশাখা মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ পাল্কি থেকে নেমে ঐ ছাতিম গাছের ছায়ায় বসে ভগবানের নাম করলেন। জায়গাটি তাঁর বড় ভাল লেগে গেল। তখনই মনে মনে সংকল্প করলেন এই জায়গাটিতে মাঝে মাঝে এসে নির্জনে তাঁর প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি যে-ভগবান, তাঁর উপাসনা করবেন। শোনা যায় মহর্ষি ওখানে জমি কিনতে চাইলে জমিদার নাকি ছাতিমতলায় দাঁড়িয়ে চারদিকে যতদূর দেখা যায় সমস্ত জমিটা মহর্ষির নামে লিখে দিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু মহর্ষি মাত্র কুড়ি বিঘা জমি কিনে একটি বাড়ি ও বাগান তৈরি করালেন—তারই নাম দিলেন শান্তিনিকেতন। এ সব যখন হয়েছিল তখন রবীন্দ্রনাথ বছর দুয়েব শিশু মাত্র। আমাদের দেশের মুনিঋষিরা যেমন নির্জনে ধর্মসাধনার জন্য লোকালয়ের থেকে দূরে আশ্রয় রচনা করতেন, মহর্ষিও তেমনি নির্জনবাস ধর্মসাধনা ও ভগবানের আরাধনার জন্য শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করলেন। তৈরি করলেন মন্দির—সেখানে রইল না কোনো বিগ্রহ বা মূর্তি। জাতিধর্মনির্বিশেষে যে কোনো সাধক নিরাকার পরব্রহ্মের ধ্যানধারণা ও সাধনার জন্য আশ্রমে গিয়ে কিছুদিন কাটাতে পারবেন আর মন্দিরে উপাসনা করতে পারবেন—এই ছিল মহর্ষির অভিলাষ। নিষেধ ছিল শুধু মদ্যপান, আমিষ আহার ও দেবদেবীর মূর্তি পূজা।

এই শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রায় চল্লিশ বছর পরে ১৩০৮ সালে বা ১৯০১ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ পাঁচটি মাত্র ছাত্র নিয়ে তাঁর

বিদ্যালয়ের সূচনা করেন। কী উদ্দেশ্য নিয়ে করেছিলেন তা আগেই বলেছি। তোমরা জান, রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে সঙ্গে এই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় সারা বিশ্বের লোকের কাছে পরিচিত। এখন সেটা কেবলমাত্র ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুল নয়, সেটা একটা প্রকাণ্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় যার নাম হল বিশ্বভারতী। শুধু ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ থেকে নয়, পৃথিবীর নানা দেশ থেকে ছাত্রছাত্রী সেখানে নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে আসে। ষাট বছর আগে যেখানে দিগন্ত প্রসারিত মাঠের মধ্যে দু-একটি মাত্র কোঁঠাবাড়ি ছিল এখন সেখানে শত শত ঘর বাড়ি, রাস্তাঘাট, বিজ্‌লি-বাতি, জলের কল, টেলিফোন টেলিগ্রাফ—যেন ছোটখাট একটি শহর। মহর্ষি যখন শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তখন কে ভেবেছিল ছাতিমতলায় দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে সেই সমস্ত জায়গাটিই শান্তিনিকেতন নামে বিখ্যাত হয়ে উঠবে পৃথিবীর লোকের কাছে এই কয় বছরের মধ্যেই।

এই শান্তিনিকেতনের আদর্শ কী? কবিতা, গান, নাটক, গল্প উপন্যাস, প্রবন্ধাদি লিখে সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যেমন অমর হয়ে রয়েছেন, তেম্‌নি তাঁর জীবনে যা কিছু কল্পনা করেছেন, যা-কিছু ভেবেছেন, দেশের লোকের জন্যে যা-কিছু করতে চেয়েছেন, তাঁর সেই সব আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হল শান্তিনিকেতন। তোমরা জান, মানুষের আদর্শ হয় খুব বড়—তাতে কখনও পৌঁছানো যায় না, তবে তার জন্যে প্রয়াস থাকে বরাবর। শান্তিনিকেতনের আদর্শ হল বড়, তার সেই উঁচু আদর্শের দিকে যাবার চেষ্টা চলেছে গত ষাট বছর ধরে একটু একটু করে। রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনধারা যেমন নানা-দিকে নানাভাবে প্রবাহিত হয়েছে, শান্তিনিকেতনও তেমনি নদীর ধারার মত আপন সহজ গতিবেগে তার পথ করে চলেছে, রবীন্দ্রনাথের জীবনবাণী অনুসরণ করে। যতদিন লক্ষ্যে পৌঁছবার তার এই

গতিবেগ থাকবে, ততদিন সে রইবে সজীব ও প্রাণবন্ত। সেই আদর্শটি কী? রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবন এবং তাঁর অজস্র রচনাবলীর মধ্য দিয়ে যে-আদর্শ ও যে মানবধর্মের বাণী প্রচার করে গেছেন, এ হল সেই আদর্শ—মানুষকে কেবলমাত্র মানুষ হিসাবে গ্রহণ করা, এবং পরস্পর মিলিত হওয়া। সকল মনুষের একমাত্র পরিচয় যে সে অমৃতের পুত্র। তার বর্ণ, তার ধর্ম, তার জাতি, তার গোত্র, মানুষের আসল পরিচয় নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের বাধা অনেক—তার ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতি, তার আচার ব্যবহার সমস্ত কিছু মস্ত মস্ত সঙ্গিন উঁচিয়ে পরস্পরকে তফাৎ করে রেখেছে। আমরা কেবলি অন্যকে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি—একের মন্দিরে মসজিদে অন্যের প্রবেশ-অধিকার নেই। পৃথিবীর সকল নরনারী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বলতে পারে না আমরা সবাই এক ভগবানের সন্তান, আমরা অমৃতের পুত্র, আমরা সব এক। বর্ণ নিয়ে কত মারামারি হানাহানি চলছে তার ইয়ত্তা নেই। কালো চামড়া, হলদে চামড়া, শাদা চামড়া—কেউ পরস্পর মিল্‌তে পারে না—একের দেশে অন্যের যাওয়া-আসা, থাকা-খাওয়া, কত বিধিনিষেধের গণ্ডি দিয়ে বাঁধা। তার উপর জাত নিয়েও কত বিরোধ। আমাদের প্রতিদিনকার খাওয়া শোওয়া ঘরকরনার কাজে আমরা কি রকম জাত মেনে চলি—পাছে অন্যের ছোঁওয়া লেগে অশুদ্ধ হয়ে যাই এই ভয়েই মরি। ভুলে যাই যে সকল মানুষই ভগবানের সন্তান, তাঁর কাছে ছোট বড় নেই।

বড় দুর্ভাগ্যের কথা—আজ মানুষের সব চেয়ে বড় শত্রু হল মানুষ। মানুষ বাঘ ভাল্লুক সিংহকে ডরায় না; পাহাড় পর্বত, বনজঙ্গল, নদী-সমুদ্র, মরুভূমি, আকাশ-পাতাল সবই সে জয় করে নিলে; সময়ের পার্থক্য ও স্থানের ব্যবধান মানুষের কাছে নেই বললেই হয়—কিন্তু এত করেও মানুষের সবচেয়ে ভয় মানুষকেই—তার পাশের জনকে, তার

প্রতিবেশীকে! এই ভয়ের থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আজ জগত্জুড়ে তরোয়াল বন্দুকের ও গোলাগুলির কী বিপুল আয়োজনই না চলেছে। পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, মাথা গোঁজবার আশ্রয় নেই, তবু মানুষের গোলাবারুদের কারখানা বেড়েই চলেছে। এই দুর্ভাগ্যের কারণ এই যে, আমরা ভুলতে বসেছি এই সমস্ত ভেদবুদ্ধির উপরেও চিরদিনের সত্য পরিচয় হচ্ছে যে সকল মানুষই একই পরমপিতার পুত্র। মানুষের এই সত্যপরিচয়ের উপলব্ধি ও সাধনার জায়গা হল শান্তিনিকেতন। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> যে-শান্তি অন্তরাত্মার, যে-সম্পদ নিত্যকালের, তারই প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা হচ্ছে ভারতবর্ষের দান। এই শ্রদ্ধাকে আবার পরিপূর্ণরূপে জাগিয়ে তোলবার দিন এসেছে। পশ্চিম ভূভাগ কামান বন্দুকের আয়োজন করুক— যে শক্তিতে সেই সমস্ত আয়োজনকে তুচ্ছ করতে পারি আত্মার সেই পরমাশক্তিকে প্রকাশ করবার জন্যে আমাদের সাধনা। এই জন্যে আমাদের নিস্পৃহ হতে হবে, নির্ভয় হতে হবে এবং বলতে হবে যেনাহং নামৃতাঃ স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম। ভারতের একটা জায়গা থেকে ভূগোল বিভাগের মায়াগণ্ডি সম্পূর্ণ মুছে যাক—সেইখানে সমস্ত পৃথিবীর অধিষ্ঠান হোক্ সেই জায়গা হোক্ আমাদের শান্তিনিকেতন। আমাদের জন্যে একটি মাত্র দেশ আছে সে হচ্ছে বসুন্ধরা, একটি মাত্র নেশন আছে সে হচ্চে মানুষ। [১৯২০ খৃষ্টাব্দে ১১ ডিসেম্বর তারিখে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে লিখিত পত্রাংশ।]

শান্তিনিকেতনে কোনও লোককে জিজ্ঞাসা করা হয় না, তুমি কোন্ ধর্মের, কোন্ গোত্রের বা কোন্ বর্ণের লোক। যখন খোলা মাঠের মধ্যে দিনের শেষে বালকবালিকারা কিছুক্ষণের জন্য আসন পেতে স্তব্ধ হয়ে বসে, তখন তাকে বলা হয় না, তুমি বিশেষ মন্ত্র বল বা বিশেষ কিছু

চিন্তা কর। তাদের কাজ হল উন্মুক্ত প্রান্তরে তারায় ভরা আকাশের তলায় যে-শান্তি যে-প্রভাব অলক্ষ্যে কাজ করছে, সমস্ত হৃদয় পেতে দিয়ে সমাহিত হয়ে তাকে অনুভব করা। এই অনুভূতির মধ্য দিয়ে তার অন্তরে যে-শক্তি অগোচরে কাজ করে, তার মূল্য জীবনে কিছু কম নয়। সকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সকল আশ্রমবাসী—হিন্দু মুসলমান, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, জৈন সকলে—পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গান গায়: আলোকের এই ঝরনাধারায় সব মলিনতা ধুইয়ে দাও, আর সমস্বরে বলে: তুমি আমাদের পিতা, তোমায় পিতা বলে যেন জানি। এ-সবের মূল্য কি কেউ হিসাব করে নির্ণয় করতে পারে? বহু বিচিত্রতা, অনেক বিরোধ থাকা সত্ত্বেও, যে-এক শাশ্বত ঐক্য মানুষের পরস্পরের সম্বন্ধের মধ্যে আছে, সেই চিরন্তন ঐক্যকে অনুভব করে, হৃদয়কে উদার করে সকলকে স্বীকার করার যে সাধনা, সেই সাধনা হল রবীন্দ্রনাথের এবং তাঁর জীবন দিয়ে গড়া মহর্ষির সাধনা-পূত শান্তিনিকেতন আশ্রমের। তাই তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন বিশ্বভারতী—সারা বিশ্বের লোকের মিলনভূমি—এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে—শান্তিনিকেতনে।

বিশ্বভারতীতে তিনি দেশের ও বিদেশের লোককে আহ্বান করে গেছেন—যাতে আমাদের দেশের জ্ঞানভাণ্ডারের পরিচয় অন্যেরা পায়, এবং আমাদের দেশের লোকে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের সংস্পর্শে আসতে পারে। আমাদের দেশের দর্শন, ইতিহাস, তত্ত্বজ্ঞান, ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতির আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে দেশবিদেশের ভাষা, দর্শন, ইতিহাস, শিল্পচর্চা তত্ত্ববিদ্যার পরিচয়ের ক্ষেত্র হল বিশ্বভারতী। এখানে সকল মানুষ: দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে…। সকলের আশ্রয় ও সমস্ত বিশ্বের নীড় হল এই বিশ্বভারতী।

কী উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে সম্বন্ধে

রবীন্দ্রনাথের সেই সময়কার তুএকটি ভাষণ থেকে নীচে কিছু কিছু তুলে দিলে বিষয়টি তোমরা পরিষ্কার বুঝতে পারবে।

> ভারতবর্ষের যা অন্তরের বস্তু তার তপস্যা ধ্যান আলোচনা কত যুগ ধরে হয়েছে, কিন্তু আমাদের পিতৃপিতামহের এই জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের কোনোই পরিচয় নেই। তুঃখ দারিদ্র্য অনেক আমাদের স্বীকার করতে হয়েছে, কিন্তু বিদ্যার ক্ষেত্রে কেন দীনতা থাকবে? এ তো আমাদেব হাতেই আছে। ভারতেব বিদ্যার ভাণ্ডারকে চাবি বন্ধ করে রাখব না। আমাদের দেশের যাঁরা জ্ঞানের ভাণ্ডারে কিছু দিয়েছেন, সকল দেশেব সকল বিদ্যাব সঙ্গে তার তুলনা হওয়া চাই— বিশ্ব-বিদ্যার সঙ্গে তুলনা করে তবে তার মূল্য অনুভব করতে পারব। জানবার একটা উপায় অপরেব সঙ্গে তুলনা করা, যাচাই করা; নইলে কোনোদিন নিজেকে যথার্থ জানব না।…আমাদের দেশের জ্ঞানকে সত্য করে ভালো করে জানবার জন্য তাকে বিশ্ব-বিদ্যার ক্ষেত্রে উপস্থিত করতে হবে; বিশ্বের সঙ্গে একক্ষেত্রে দাঁড়াবার আমাদের এই যে অনুষ্ঠান…… এখানে সর্বমানবের যোগসাধনের সেতু রচিত হবে। অতিথিশালার দ্বার খুলবে, যার চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আমরা সকলকে আহ্বান করতে কুণ্ঠিত হব না। এই মিলনক্ষেত্রে আমাদের সম্পদকে ভুললে চলবে না, সেই ঐশ্বর্যের প্রতি একান্ত আস্থা স্থাপন করে তাকে শ্রদ্ধায় গ্রহণ করতে হবে।…

জ্ঞানচর্চার নানা ব্যবস্থা বিশ্বভারতীতে করলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি আশেপাশের গ্রামবাসীদের কথা ভুললেন না। আমাদের দেশের অধিবাসীর বেশীর ভাগ হল গ্রামবাসী। রবীন্দ্রনাথ যৌবন কালে নিজের জমিদারি দেখাশোনা করেছেন বছরের পর বছর। উত্তর বঙ্গের গ্রামে গ্রামে নদীতে নদীতে জীবন কাটিয়েছেন। গ্রামের লোকদের সংস্পর্শে এসেছেন, তাদের সুখ তুঃখের পরিচয় পেয়েছেন।

তাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় কোথায় কোন অভাব অভিযোগ আছে তা খুব ভাল করে দেখেছিলেন। তাদের অবস্থার যাতে উন্নতি হয়, তাদের আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক জীবনযাত্রার মান যাতে বাড়ে, তাদের মধ্যে শিক্ষা, স্বাবলম্বন, সমবায় প্রভৃতি যাতে বিস্তার লাভ করে তার জন্যে তাঁর নিজের জমিদারীতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। শুধু তাই নয়, ভাল করে এসব বিষয়ে ভেবেছেন, দেশের লোকের কাছে প্রবন্ধ পড়ে বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু দেশেব লোক বা ইংরেজ সরকার তখন সে সব কাজ গ্রহণ করে নি। তাই তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রম থেকে মাইল দুই দূবে একটা পোড়ো কুঠিবাড়ি ও জমি কিনে পল্লীসংগঠন বিভাগ সুরু করে দিলেন—তাব নাম দিলেন শ্রীনিকেতন। বহু বৎসব পরে ইংরেজ শাসনের অবসান হলে দেশের লোকে যখন নিজেদের উন্নতির কথা নিজেরা ভাবতে সুরু করলে, তখন সকলের দৃষ্টি গেল গ্রামের দিকে। যে-সব কাজের কথা রবীন্দ্রনাথ চল্লিশ পঞ্চাশ বছব আগে দেশবাসীকে বলেছিলেন, সেই সব কাজের ভিত্তিতে আমাদের সরকার গ্রামে গ্রামে উন্নতির চেষ্টা করছেন। শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে পল্লীসংগঠন বিভাগ গঠিত হয়েছে। এ সবের পিছনে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ও পরিশ্রম সে কথা তোমরা ভুলোনা। আর এ বিষয়ে তাঁব লেখা প্রবন্ধগুলো বড় হয়ে অবশ্যই পোড়ো।

বিশ্বভারতীতে নানা বিষয়ের শিক্ষার বিভাগ আছে এই বিভাগ গুলিকে বলা হয় ভবন। বিভিন্ন ভবনে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশ্বভারতীর বিশেষত্ব হল এখানে অ-আ-ক-খ থেকে বিদ্যারম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষা পর্যন্ত একই জায়গায় একই পরিবেশের মধ্যে শেষ করা যায়। স্কুল কলেজেব পরীক্ষা পাশ করে কেউ যদি কোনও বিশেষ বিষয়ের গবেষণা করে পণ্ডিত হতে চায়,

তাহলে সে সুযোগ আছে বিদ্যাভবন, চীনভবন হিন্দিভবন প্রভৃতিতে। যদি কেউ কোনও বিশেষ শিল্পকলা বা সংগীতচর্চা করে পারদর্শী হতে চায় তাদের জন্য রয়েছে কলাভবন ও সংগীতভবন। বি. এ, এম. এ. পাশ করে কেউ যদি শিক্ষাব্রত গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে, তার সুবিধা আছে বিনয়-ভবনে। কেউ যদি হাতের কাজ শিখে কারুশিল্পী হতে চায়, তা হতে পারে শ্রীনিকেতনের শিল্পসদনে। কাঠের কাজ, তাঁতের কাজ, চামড়ার কাজ, প্রভৃতি শেখার ব্যবস্থা সেখানে আছে। চাষবাস পশুপালন প্রভৃতি শেখার জন্য আছে গ্রামীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (Rural Institute)। লেখাপড়া শেখার পর যদি কেউ গ্রামে দেশের লোকের শিক্ষা ও নানা বিষয়ের উন্নতিকে জীবনের কাজ বলে গ্রহণ করে, তার জন্য আছে সমাজ-শিক্ষা শিক্ষণ কেন্দ্র। এ সব থেকে বুঝতে পারছ বিশ্বভারতীতে কত রকম শিক্ষার গোড়াপত্তন রবীন্দ্রনাথ করে গিয়েছিলেন এবং দিনে দিনে আরও কত ব্যবস্থা হচ্ছে ও হবার সম্ভাবনা আছে।

বৎসরে বৎসরে শান্তিনিকেতনে নানা রকম উৎসব হয়ে থাকে। এ সব উৎসব প্রবর্তন করেন রবীন্দ্রনাথ। এই উৎসবগুলি সকল মানুষের জন্য– কোনও বিশেষ সম্প্রদায় বা ধর্মের লোকের জন্য নয়; বিশেষত ঋতু উৎসবগুলি। বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব, বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ, নববর্ষ-প্রভৃতি উৎসবগুলি শান্তিনিকেতনে হয়ে থাকে।

বর্ষা ঋতুতে কয়েক বৎসর ধরে সরকারী চেষ্টায় বনমহোৎসব সারা ভারতবর্ষে হয়ে থাকে তা তোমরা জান। দেশের গাছপালা যাতে দিন দিন বাড়ে তারই জন্য ভারত-সরকারের এই ব্যবস্থা। কিন্তু তোমরা জান কি সরকারী চেষ্টার বহু বৎসর আগে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমের আশেপাশে শূন্য প্রান্তরের মধ্যে প্রতিবৎসর শ্রাবণ মাসে বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন? ১৩৪৮ সালে তাঁর

মৃত্যুর পরে প্রতি বৎসর বাইশে শ্রাবণে শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। শান্তিনিকেতনের চারিদিকে মরুভূমির মত প্রান্তর নানা গাছপালায় পূর্ণ হয়ে উঠ্ছে ধীরে ধীরে। এই উৎসব কী ভাবে গানে, কবিতায়, বৃক্ষবন্দনায়, মুখরিত ও রূপে সজ্জায় সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়, তা যারা না দেখেছে তারা ভাল করে ধারণা করতে পারবে না। অনেক স্কুলকলেজের ছেলেমেয়েরা রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত বৃক্ষরোপণ উৎসবে মরু বিজয়ের কেতন উড়াও—গান গেয়ে কত আনন্দ পায়।

শান্তিনিকেতনের সব চেয়ে বড় উৎসব পৌষ-মেলার কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। একে সাতই পৌষের উৎসব বলা হয়। সাতই পৌষ দিনটির বিশেষত্ব কী এবং কেনই বা ঐ দিনে এত সমারোহে উৎসব হয়ে থাকে সে সকল কথা তোমাদের জেনে রাখা ভাল, তাই দু-চার কথায় সে সম্বন্ধে কিছু বলি।

দেবেন্দ্রনাথের বয়স যখন আঠারো উনিশ তখন থেকেই ধর্মলাভ করবার জন্য তাঁর মধ্যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা আসে। কিছুদিন পরে একদিন অকস্মাৎ উপনিষদের একখানা ছেঁড়া পাতা হাওয়ায় উড়ে তাঁর হাতে পড়ল। তাতে এই শ্লোকটি ছিল :

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনং।

এই শ্লোকটির মানে হল :

এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ, সমুদায় পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপৃত রহিয়াছে। পাপ-চিন্তা ও বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানকে উপভোগ কর; কাহারও ধনে লোভ করিও না।

মহর্ষির আত্মজীবনী বাংলা ভাষার একখানি বিখ্যাত বই। বড় হয়ে সেটা পড়ে দেখো। এই বইতে তিনি লিখেছেন :

যখন ঈশাবাস্যমিদং সর্বং—ইহার অর্থ বুঝিলাম, তখন স্বর্গ হইতে অমৃত আসিয়া আমাকে অভিষেক করিল।

এর পর থেকেই তার জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি ক্রমশঃ রাজা রামমোহন রায়—প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন এবং বহু শাস্ত্রাদি পাঠ করে ঐ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২১ ডিসেম্বর বাংলা ৭ই পৌষ তারিখে ছাব্বিশ বৎসর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

দীক্ষাগ্রহণের এই দিনটিকে নিজের জীবনে দেবেন্দ্রনাথ বিশেষ পবিত্র দিন বলে সারাজীবন দেখেছেন। এই দিনটিকে আপনার প্রকৃত জন্মদিন বলে মনে করতেন। ঐ দিনে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি উৎসব করতেন। শান্তিনিকেতন আশ্রম সর্বসাধারণের জন্যে উৎসর্গীকৃত হওয়ার পর থেকে ৭ই পৌষ দীক্ষাগ্রহণের পুণ্য দিনটি চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্য সেখানে প্রতি বৎসর উৎসব ও মেলার ব্যবস্থা তিনি করে গিয়েছেন। সেই থেকে শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের উৎসব হয়ে আসছে।

মহর্ষির এই দীক্ষার দিনটি রবীন্দ্রনাথও চিরদিন বিশেষ পবিত্র ও পুণ্যদিন বলে পালন করতেন। ৭ই পৌষের উৎসবে তিনি মন্দিরে যে সকল ভাষণ দিয়েছেন, তার থেকে কিছু অংশ এখানে তুলে দিলে তোমরা বুঝতে পারবে মহর্ষির জীবন, সাধনা ও দীক্ষার দিনের সঙ্গে শান্তিনিকেতন আশ্রমের যোগ কত গভীর ও চিরন্তন।

একদিন যাঁরা চেতনা বিলাসের আরামশয্যা থেকে হঠাৎ জেগে উঠেছিল, এই ৭ই পৌষ দিনটি সেই দেবেন্দ্রনাথের দিন। এই দিনটিকে তিনি আমাদের জন্য দান করে গিয়েছেন।·· সেই সাধু সাধক তাঁর জীবনের সকলের চেয়ে বড়ো দিনটিকে, তাঁর দীক্ষার

দিনটিকে, এই নির্জন প্রান্তরের মুক্ত আকাশ ও নির্মল আলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে দিয়ে গেছেন। তাঁর সেই মহাদিনটির চারিদিকে এই মন্দির, এই আশ্রম, এই বিদ্যালয় প্রতিদিন আকার ধারণ করে উঠছে; আমাদের জীবন, আমাদের হৃদয়, আমাদের চেতনা একে বেষ্টন করে দাঁড়িয়েছে; এই দিনটির আহ্বানে কল্যাণ মূর্তিমান হয়ে এখানে আবির্ভূত হয়েছে; এবং তাঁর সেই সত্যদীক্ষার দিনটি ধনী ও দরিদ্রকে বালক ও বৃদ্ধকে, জ্ঞানী ও মূর্খকে বর্ষে বর্ষে আনন্দ-উৎসবে আমন্ত্রণ করে আসছে।···
শান্তিনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসবের সফলতার মর্মস্থান যদি যদি উদ্‌ঘাটন করে দেখি তবে দেখ্‌তে পাব, এর মধ্যে সেই বীজ অমর হয়ে আছে যে বীজ থেকে এই আশ্রম বনস্পতি জন্মলাভ করেছে, সে হচ্ছে সেই দীক্ষাগ্রহণের বীজ। মহর্ষির জীবনের দীক্ষা এই আশ্রম বনস্পতিতে আজ আমাদের জন্য ফলছে এবং আমাদের আগামীকালের উত্তরবংশীয়দের জন্য ফলতেই থাকবে।

যদিও ৭ই পৌষ তারিখে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূত্রপাত হয়েছিল তথাপি ঐ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবসের সাম্বৎসরিক উৎসব প্রতিবৎসর ৮ই পৌষ তারিখেই হয়ে থাকে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব এই সাম্বৎসরিক উৎসবের অন্তর্গত বিশেষ অনুষ্ঠান।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের মোটামুটি কথা এবং তাঁর বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যালয় শান্তিনিকেতনের কথা এতক্ষণ বললাম।

ছোটবেলা থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি অজস্র কবিতা, গান, নাটক, গল্প উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখে বাংলাদেশের খুব বড় কবি ও লেখক বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বাংলাদেশের বাইরে তাঁর নাম বড় বেশি কেউ জানত না। তাঁর বয়স যখন পঞ্চাশ পার

হল, তখন তিনি আর একবার (১৯১২) বিলাত গেলেন। এর আগে আরও দুবার গিয়েছিলেন একবার সতেরো বছর বয়সে ব্যারিস্টারি পড়তে আর একবার যুবা বয়সে অল্প দিনের জন্য বেড়াতে। এর পরে অবশ্য বহুবার তিনি পৃথিবীর প্রায় সব দেশে গেছেন— সে সব কথা বড হয়ে তোমরা জানবে যখন তাঁর বড় জীবনী পড়বে। পঞ্চাশ বছর বয়সে তাঁর বিলাত যাওয়ার পর থেকে তাঁর নাম খুব বড় কবি বলে পৃথিবীর লোকের কাছে বিখ্যাত হয়ে গেল।

বিলাত রওনা হবার আগে এবং পথে জাহাজে বসে, সময় কাটাবার উদ্দেশ্যে তিনি কতকগুলি গান ও কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করলেন। তার মধ্যে সদ্য প্রকাশিত গীতাঞ্জলির অনেকগুলি কবিতা ছাড়া, খেয়া, নৈবেদ্য প্রভৃতি বইয়ের কয়েকটি কবিতার অনুবাদও ছিল মোট সংখ্যা মাত্র ১০৩ টি। যদি কোনও বন্ধু বিলাতে তাঁর কবিতার নমুনা দেখতে চান, তাহলে এই অনুবাদগুলি তাঁদের হাতে দেবেন এই ছিল অভিপ্রায়। এই অনুবাদগ্রন্থের নাম দিলেন Gitanjali ইংরেজিতে Song Offerings।

প্রথম প্রথম এই বইটির পাণ্ডুলিপি বন্ধুমহলে হাতে হাতে ঘুরল। যারা পড়লেন, তাঁরাই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সে সময়ের বড় কবি য়েট্‌স্ সেগুলি পড়ে বললেন :

আমার সমসাময়িক এমন কোনো ব্যক্তিকে আমি জানিনা, যিনি এমন কোনো রচনা ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, এই কবিতাগুলির সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে। এই গদ্যানুবাদগুলি পাঠে আমি দেখিতে পাইতেছি যে, কি রচনারীতিতে, কি চিন্তায় ইহারা অতুলনীয়। [রবীন্দ্রজীবনী দ্বিতীয় খণ্ড

কবিতাগুলি শুনে একজন মহিলা কবি লিখেছিলেন :

যে দিন প্রথম বাইবেলের কয়েকটি অংশ পাঠ করিয়াছিলাম,

সেই দিনটি বাদে, আমার মনে পড়েনা যে গতরাত্রে যেমন অনুভব করিয়াছিলাম, জীবনে আর কোনদিন সেইরূপ অনুভব করিয়াছি কি না।

এই দুটি উক্তি থেকেই বুঝতে পারছ, ইংরেজি গীতাঞ্জলির কবিতাগুলিকে লোকে কী রকম সমাদর করে গ্রহণ করেছিল।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে এই ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রথম প্রকাশিত হলে, য়ুরোপ আমেরিকার লোকে একে সাদরে গ্রহণ করে নিল। এই সামান্য কয়েকটি অনুবাদের মধ্যে তারা এমন জিনিষ পেল, যা কোনও বিশেষ ধর্মের, দেশের, জাতির বা বর্ণের কথা নয়—যা জাতিধর্মনির্বিশেষে যে-কোনও মানুষের অন্তরের কথা, যে-কথা সাধকের হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে উঠেছে বিশ্বপিতার উদ্দেশে। তাই ইংরেজি গীতাঞ্জলি পড়ে কত লোক জীবনে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথের কাছে অসংখ্য চিঠিপত্র আসত। একখানা চিঠিতে একজন ইংরেজ মহিলা লিখেছিলেন :

I am a working woman. I read every day Songs of Solomon and Song Offerings of Rabindranath Tagore.

বাইবেল পড়ে তিনি যেমন উপকৃত হন, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির কবিতা পড়ে তার থেকে কম লাভ হয় না।

কলকাতার কোনও বিদেশী পাদ্রী গির্জায় উপাসনার সময় বাইবেলের সঙ্গে গীতাঞ্জলির কবিতাও পাঠ করতেন। ইংরেজি গীতাঞ্জলির কবিতার দু একটা উদাহরণ দিলে তোমাদের নিশ্চয়ই ভাল লাগবে—বুঝবে কী-ভাবের কবিতা ও তার অনুবাদ ঐ বইয়ে আছে। নীচের গানটা তোমাদের মধ্যে অনেকে হয়ত জান :

প্রতিদিন আমি হে জীবন স্বামী, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে,
করি জোড়কর হে ভুবনেশ্বর. দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে,
তোমার অপার আকাশের তলে বিজনে বিরলে হে
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে দাঁড়াব তোমার সম্মুখে।

এর অনুবাদটা দিই :

Day after day O lord of my life, shall I
stand before thee face to face. With folded hands,
O lord of all worlds, shall I stand before thee
face to face
Under thy great sky in solitude and in silence,
With humble heart shall I stand before thee
face to face.

তেমনি নৈবেদ্যের এই কবিতাটা পড়েছ বোধ হয় :

আমার সকল অঙ্গে তোমার পরশ
লগ্ন হয়ে রহিয়াছে রজনী দিবস
প্রাণেশ্বর, এই কথা নিত্য মনে আনি
রাখিব পবিত্র করি মোর তনু খানি।

আর এর ইংরেজি হল :

Life of my life, I shall ever try to keep my body
pure, knowing that thy living touch is upon
all my limbs.

এ সব কবিতা পৃথিবীর যে-কোনও লোকের কাছে প্রিয় ও সমাদৃত হতে কোনও বাধা হয় না—এ সব কবিতাব ভাবের সঙ্গে কারো কোনও বিরোধ হবার সম্ভাবনা নেই। তাই গীতাঞ্জলিকে সকল দেশের লোক একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে গ্রহণ করল। এই বইয়ের

কবিতাগুলির কেবলমাত্র উঁচু ভাবের সংস্পর্শে এসে পশ্চিমের লোক যে মুগ্ধ হল তা নয়, এই অনুবাদের সুন্দর ইংরেজি ভাষাও তাদের বিস্মিত করল।

ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যেই পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের নোবেল পুরস্কার রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হল। সম্মান হিসাবে এই পুরস্কার একটি শ্রেষ্ঠ ও আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। নগদ আট হাজার পাউণ্ড—যা নাকি এক লাখ টাকার উপরে, খুব বড় একটি স্বর্ণপদক এবং একখানি মানপত্র এই পুরস্কারের অঙ্গ। আর এ সবের সঙ্গে পৃথিবী জুড়ে যে-যশ ও সম্মান পাওয়া যায়, তার মূল্য নির্ণয় করা যায় না।

নোবেল পুরস্কার-জিনিষটা কী সে সম্বন্ধে একটু বলি। গত উনবিংশ শতাব্দীতে সুইডেন দেশে এলফ্রেড্ নোবেল (Alfred Nobel) নামে একজন রাসায়নিক ডাইনামাইট্-নামে বারুদের মত একরকম শক্তিশালী বিস্ফোরক আবিষ্কার করেন। নূতন রেললাইন, রাস্তাঘাট করতে অনেক সময়ে পাহাড়ের অংশ, বড় বড় পাথর ভেঙে সরাতে হয়। সে সব ভাঙার কাজে এই বিস্ফোরক দরকার হয়।

নোবেলসাহেব মারা যাবার আগে অনেক কোটি টাকার সম্পত্তি সুইডেন সরকারের হাতে দিয়ে যান— পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, শান্তিকামী, রাষ্ট্রনীতিবিদ্ প্রভৃতিকে বৎসর বৎসর যাতে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য। এই ব্যবস্থার ভার দেওয়া হয় সুইডিস একাডেমি-নামে সুইডেনদেশের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বিদ্বজ্জন সমিতির উপরে। এই সমিতির বিবেচনায় যিনি যে-বিষয়ে পুরস্কার পাবার যোগ্য বিবেচিত হন, তিনি এই বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হলে, তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিক হিসাবে ঐ পুরস্কার দেওয়া

হয়। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গান ও কবিতার মধ্যে মাত্র ১০৩টি কবিতার অনুবাদ পেয়ে পশ্চিম দেশ তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকার করে নিল। এ কি কম আশ্চর্যের কথা!

আর একজন ভারতীয় বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার জন্যে এই পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর নামটা নিশ্চয়ই জান—না জানলে জেনে নিও।

রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করে বাংলাদেশের আর একজন বড় কবি লিখেছিলেন :

জগত-কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব,
বাঙালী আজ গানের রাজা বাঙালী নহে খর্ব।

এ কথা যে কত সত্য তা তাঁর নোবেল পুরস্কার পাবার পর দেশবাসী বুঝতে পারল।

নোবেল পুরস্কার পাবার পর থেকে দেশে ও বিদেশে রবীন্দ্রনাথের নাম খুব ছড়িয়ে পড়ল। দেশে দেশে তাঁর গীতাঞ্জলির ও অন্যান্য বইয়ের তর্জমা হু হু করে বার হতে থাকল। রবীন্দ্রনাথের নাম ও সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীও জগতের লোকের কাছে মান ও ভালবাসার পাত্র হয়ে দাঁড়াল। কিছুদিন পরেই (১৯১৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ য়ুরোপকে আলোড়িত করে তোলে। ভারতবর্ষ থেকে একদল ভারতীয় সৈনিক য়ুরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা দিয়েছিল। তাদের ট্রেন যখন ইটালীর মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, তখন কোনও ষ্টেশনে গাড়ি থামলে সেখানকার অধিবাসীরা ফুল ও ফল এনে সৈনিকদের হাতে দিয়ে বলে, To the countrymen of Tagore—ঠাকুরের দেশের লোকদের দিলাম। কেবলমাত্র বড় কবি হিসাবে তিনি দেশবিদেশের লোকের হৃদয় জয় করতে পেরেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীও বিদেশীর কাছে আদরের পাত্র বলে গণ্য হল।

ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হবার পর থেকে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি বাংলা বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অধিকাংশ বইয়ের অনুবাদ তাঁর নিজেরই করা— দু চার খানা বই অন্য কেউ কেউ করেছিলেন। তাঁর সব বই নানা ভাষায় অনূদিত হতে দেরি হয়নি এবং সকল দেশেই বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। তাঁর বইগুলি লোককে কী ভাবে স্পর্শ করেছিল তা দু-একটি ঘটনা থেকে বেশ বোঝা যায়।

কালিম্পং-এ একদিন সন্ধ্যেবেলা তাঁর কাছে বসে আছি,—তখন (য়ুরোপে) ঘোরতর মহাযুদ্ধ চলেছে,…রোজই সবাই মিলে রেডিওর সংবাদ শোনা হচ্ছে,…মাদ্‌মোসেল বস্‌নেক্ বলে একটি ফরাসী মহিলা আমাদের সঙ্গে ছিলেন,—ফ্রান্সের খবর তাই খুঁটিয়ে শোনা হত।… প্যারিসের সেদিন পতন হয়েছে। গুরুদেবের শরীরটা ক্লান্ত ছিল, চুপচাপ বিশ্রাম করছেন। হঠাৎ দরজার কাছে উত্তেজিত অথচ মৃদু করুণ কণ্ঠস্বরে 'গুরুদেব' বলে মাদ্‌মোসেল ঘরে ঢুকে তাঁর বিছানার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন—গুরুদেব আজ ওরা প্যারিসে ডাকঘর অভিনয় করছে, এখন।

গুরুদেব উঠে বসলেন। আজ? আজ ওরা ডাকঘর অভিনয় করছে? একটু স্তব্ধ হয়ে থেকে আবার যেমনি ছিলেন তেমনি শুয়ে পড়লেন, শুধু উত্তেজিত ভাবে পা নড়ছিল। অনেকক্ষণ পরে বললেন সেবারও রাশিয়াতে ওদের দারুণ দুঃখের দিনে ওরা বার বার অভিনয় করেছে King of the Dark Chamber (রাজা)। দীর্ঘ নীরবতার পর বললেন একেই বলে পুরস্কার!

বিদেশে তিনি প্রভূত রাজকীয় সম্মান পেয়েছিলেন। যাঁরা তাঁর রচনা পড়বার সুযোগ পাননি তাঁরাও তাঁর আশ্চর্য প্রতিভার সম্মোহনে মোহিত হয়েছেন। জার্মেনিতে ফুল-বিছানো পথ দিয়ে তাঁকে নিয়ে গেছে। কোনো ভারতীয় ইতিপূর্বে এমন সম্মান

পায় নি। আমাদের এক হাঙ্গেরিয়ান বন্ধুর কাছে গল্প শুনেছিলুম: তাদের দেশে যখন তিনি যান কেউ যে গিয়ে কথা বলবে কবির সঙ্গে সে স্পর্ধা সে সাহস রাখেনা, শুধু একবার দেখবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সারি দিয়ে পথে দাঁড়িয়ে আছে। কবি যে মানুষের হৃদয়ের দরজায় প্রেমের অতিথি। এই প্রীতি তিনি দেশে বিদেশে যোগ্য ও অযোগ্য সকলরকম মানুষের কাছ থেকে পেয়েছেন অজস্রধারায়। ..

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী-লিখিত মংপুতে রবীন্দ্রনাথ-নামে বই থেকে উপরের কথাগুলো তুলে দিলাম।

শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশ বাইশে শ্রাবণ-বইয়ে লিখেছেন:

যুরোপের সর্বত্র কবি যে রাজার মতো সম্মান পেয়েছিলেন, তার সত্যকার রূপটি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল তা প্রত্যক্ষ করবার। কিন্তু দেখেছি সমস্ত সম্মানের চেয়েও ওঁকে বেশি স্পর্শ করেছিল ধনীদরিদ্র-নির্বিশেষে মানুষের ভালবাসা। একদিন ভিয়েনাতে আমাকে বলেছিলেন, এরা আমার মধ্যে কী দেখেছে, কেন এত ভাল বেসেছে বুঝতে পারি নে। কিন্তু যখন পুত্রশোকাতুরা মা, কি অল্পবয়সী বিধবা মেয়ে আমাকে এসে বলে যায় যে আমি তাদের জীবনে শান্তি দিয়েছি, তাই তারা আমাকে এত ভালবাসে, তখন বুঝি আমার গীতাঞ্জলির ভিতর দিয়ে আমি আমার বড়ো-আমিকে প্রকাশ করেছি, যার সঙ্গে এই প্রতিদিনের আমিটার অনেক তফাৎ। গীতাঞ্জলি শুধুই যদি কবিতা হতো, তা হলে জনসাধারণের মনে এমন করে স্থান পেতুম না; কারণ কয়জনই বা কবিতা বোঝে? এই বড়ো জায়গায় মনকে পৌঁছে দিতে উপনিষদ আমাকে সাহায্য করেছে। যুদ্ধের পরে সমস্ত

যুরোপ মনের একটি আশ্রয় পেতে চাচ্ছে, তাই এরা আমাকে এত ভালবাসে।

সম্প্রতি একজন বাঙালী মহিলা জার্মেনি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এক পত্রিকায় লিখেছেন .

বার্লিনে একটি দোকান ছিল যেখান থেকে আমরা ফার (Fur) কিনতাম অথবা তৈরি করাতাম। দোকানী বিল বইতে আমাদের নাম-ধাম কী লিখতো জানি না, কিন্তু কোনোদিন আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা করে নি। একদিন একজন ভারতীয় বন্ধুকে নিয়ে গিয়েছি তার দোকানে, তাঁর ওভারকোটের ফার-লাইনিং (fur lining) করাবেন বলে। সেদিনও দোকানদার আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা না করেই যথারীতি বইতে খস্ খস্ করে কী লিখল। আমি সেদিন আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম— আচ্ছা, আপনি ত কোনোদিনই আমাদের নাম অথবা ঠিকানা কিছুই জিজ্ঞাসা করেন না, অথচ আপনার বইতে কী লেখেন বলুন? সে তার বইটি দেখালে: নাম: Tagore, ঠিকানা: India. এর পরে কোন রকম মন্তব্য দরকার করে না। [বসুধারা অগ্রহায়ণ ১৩৬৬। প্রভাতী মুখোপাধ্যায়-জনান্তিকে।

ইংরেজি গীতাঞ্জলি যে কত লোকের অনুপ্রেরণা ও সান্ত্বনার আশ্রয় স্বরূপ ছিল তা দু-একটি ঘটনা থেকে বেশ বোঝা যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুরু হবার সময়ে ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন বৃদ্ধ ক্লেমাসোঁ। তিনি যখন খবর পেলেন জার্মেনি তাঁর স্বদেশ আক্রমণ করেছে, তখন তিনি ফরাসী ভাষায় অনূদিত গীতাঞ্জলিখানা খুলে অনেকক্ষণ ধরে পড়লেন—তাতে তিনি মনে শান্তি ও সান্ত্বনা পেয়েছিলেন।

ঐ যুদ্ধের সময়ের আর একটি ঘটনা বড় করুণ। যুদ্ধ বাধলে ইংলণ্ডের সকল যুবককে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন উইল্‌ফ্রেড্ ওয়েন্ নামে একজন প্রতিভাশালী কবি, বয়স মাত্র পঁচিশ। ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা হবার আগে তাঁর মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে সামনে বিশাল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ভাবাক্রান্ত হৃদয়ে একটি কবিতা আস্তে আস্তে আবৃত্তি করে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান। কবিতাটি এই :

When I go from hence let this be my parting
word, that what I have seen is unsurpassable.
I have tasted of the hidden honey of this lotus that
expands on the ocean of light, and thus am I blessed.
Let this be my parting word.

আর তিনি মায়ের কাছে ফিরে আসেন নি। যুদ্ধ শেষ হবার সপ্তাহ খানেক আগে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। মায়ের কাছে ফিরে এল অনেক দিন পরে ছেলের কবিতার খাতা, নোটবই ইত্যাদি। নোটবই খুলে মা দেখ্‌লেন যে কবিতা বলে ছেলে শেষ বিদায় নিয়ে গিয়েছিল, সেই কবিতাটি ঐ নোটবইয়ে লেখা আর তার নিচে কবির নাম— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মা তখন জানতে পারলেন কবিতাটি কার লেখা। এর বছর দেড় দুই পরে (১৯২০) রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে গেলে উইল্‌ফ্রেড ওয়েনের মা এই ঘটনাটি চিঠি লিখে তাঁকে জানান এবং জানতে চান তাঁর কোন্ বইয়ে এই কবিতাটি আছে। রবীন্দ্রনাথ ওয়েনের মাকে সুন্দর একখানি চিঠি লেখেন এবং এক খণ্ড ইংরেজি গীতাঞ্জলি পাঠিয়ে দেন। ইংরেজি কবিতাটি বাংলা গীতাঞ্জলির একটি কবিতার অনুবাদ :

যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই—
যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।

এই জ্যোতিঃ সমুদ্রমাঝে যে-শতদল পদ্মরাজে
তারি মধু পান করেছি ধন্য আমি তাই—
যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।

ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রকাশের বছর তিন চার পরে তিনি জাপান ঘুরে আমেরিকায় যান। সেখানে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতায় ভারতবর্ষের বাণী অর্থাৎ শান্তিনিকেতনের যে আদর্শের কথা আগে বলা হয়েছে, সেই সব কথা বলেন। সে সময়ে য়ুরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে—মানুষে মানুষে মারামারি হানাহানি অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠেছিল। মানুষের পরস্পরের এই আত্মঘাতী সর্বনাশের তীব্র নিন্দা রবীন্দ্রনাথ করেন। তাঁর এই সমস্ত রচনা অনেক লোককে বিচলিত করেছিল— বিশেষত Nationalism নামে প্রকাশিত তাঁর বক্তৃতা লোককে খুবই ভাবিয়ে তুলেছিল।

মোটা মোটা চার খণ্ডে লেখা রবীন্দ্রজীবনীর কথা তোমরা জান কিনা জানিনে। তার লেখক হলেন শান্তিনিকেতনের প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তাতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। বিদেশে রবীন্দ্রনাথের রচনা লোকে কিভাবে গ্রহণ করেছিল এবং তার প্রভাব কিরকম হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথকে বিদেশে কিরকম সম্মান দিয়েছিল, সেসব কথা ঐ বইতে খুব ভাল করে লেখা আছে। ঐ বই থেকে একটা ঘটনার কথা বলি : শোনা যায় প্রথম যুদ্ধের মধ্যে ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে টাইপ করা Nationalism বইয়ের কপি সৈনিকদের মধ্যে চালাচালি হত। Max Plowman-নামে একজন তেজস্বী ইংরেজ যুবক ১৯১৪ সালে যুদ্ধে যোগ দেন। কিন্তু ১৯১৭ সালে রবীন্দ্রনাথের লেখা Nationalism বইখানা পড়ে তাঁর জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। তিনি আর যুদ্ধ করবেন না বলে স্থির করেন, এর জন্য সমরবিভাগ থেকে তাঁকে বিশেষ শাস্তি ভোগ করতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের লেখা গান, কবিতা, নাটক প্রভৃতি পড়ে জীবনের গতির পরিবর্তন হয়ে গেছে এমন লোক আমাদের দেশেও নিশ্চয়ই অনেক আছেন।

কাদম্বিনী দেবী নামে একজন বালিকা রাজর্ষি উপন্যাসখানা পড়ে এত ব্যাকুল হয়েছিলেন যে নিজেদের বাড়িতে দুর্গোৎসবে পশুবলি বন্ধ করার জন্য তিনি আহার ত্যাগ করেছিলেন। তিনদিন পরে বাড়িব লোকে বলি বন্ধ করাব প্রতিজ্ঞা করলে বালিকা অন্ন গ্রহণ কবেন।

বিশ্বযুদ্ধেব আবম্ভের সময়ে বর্মায় (ভাবতের পূর্বপ্রান্তবর্তী দেশে) এক বাঙালী পরিবার বাস করত। জাপানী বোমারু উড়োজাহাজ মাথার উপব প্রায়ই যাতায়াত করত, সর্বদাই বোমা পড়াব ভয় ছিল। ভয়ে অভিভূত না হয়ে মনে বল পাবার জন্য বাড়িসুদ্ধ সবাই এক সঙ্গে বসে বাব বাব রবীন্দ্রনাথের গান গাইত :

ওবে ভীরু, তোমাব হাতে নাই ভুবনের ভার

হালের কাছে মাঝি আছে করতে তরী পার।

ভগবানের উপর নির্ভর করে আতঙ্কেব দিনগুলি কাটিয়েছে— মনে মনে জানত :

দুঃখ যে তোর নয়রে চিরন্তন,

পার আছে রে এই সাগরের বিপুল ক্রন্দন।

এই ভাবে রবীন্দ্রনাথের গান কবিতা রচনাবলী কত লোকের আশা ভরসা সান্ত্বনা ও শান্তির আশ্রয় তা কি সহজে নির্ণয় করা যায় ?

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর প্রায় সব দেশ ভ্রমণ কবেছেন—দক্ষিণ আফ্রিকা আর অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া। শুধু শুধু বেড়ানো নয়, রাজার মত সমারোহে তিনি সব দেশে সম্মানিত ও সমাদৃত হয়েছেন। তাঁর গীতাঞ্জলি, ডাকঘর, রাজা প্রভৃতি লেখা সকল দেশের লোককে অভিভূত করেছিল।

ত ছাড়া তাঁর দেবনন্দিত সুন্দর কান্তি তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বর তাঁর কথা বলার ভঙ্গী, আলাপ আলোচনা প্রভৃতিতে লোকে কম আকৃষ্ট হয় নি। এ সব কথা রবীন্দ্র-জীবনী পড়লে জানা যায়। দু-একটা ঘটনা বলি :

'কবিকে সব থেকে সম্মান দিয়েছিল রটারডামবাসী—নগরের প্রধান গির্জার বেদী থেকে কবিকে ভাষণ দেবার ব্যবস্থা করেছিল। এ পর্যন্ত কখনো কোনো অখৃষ্টানকে তারা এ সম্মান দেয়নি।

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহাগেনে পৌঁছে দেখেন, নোবেল পুরস্কার প্রাপক ভারতীয় কবিকে দেখবার জন্য সে কী বিরাট জনতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার পর ছাত্ররা মশাল জেলে শোভাযাত্রা করে কবিকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেল এবং তারপর অনেক রাত পর্যন্ত প্রাঙ্গণে উৎসব ও হৈ হুল্লোড় করল। কবি সহাস্য মুখে তাদের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন।

সুইডেনের উপসালা নগরে গেলেন। সেখানকার মহাদেবালয়ে কবিকে বক্তৃতা করতে হল। 'এই নগরের প্রধান পাদ্রী উপস্থিত থাকতে অন্য ধর্মাবলম্বী লোককে চার্চের ভিতর থেকে উপদেশ দেবার সম্মান ইতিপূর্বে কখনো কাউকে দেওয়া হয় নি। রবীন্দ্রনাথকে তারা সে সম্মানও দিল।'

... অখৃষ্টান এশিয়াবাসীকে খৃষ্টীয় য়ুরোপ যে সম্মান দিল, তা সত্যই অভাবনীয়; রবীন্দ্রনাথও বিস্মিত। তিনি একটা চিঠিতে লিখেছেন: পশ্চিম দেশের হৃদয়ে আজ উচ্ছল জোয়ার এসে তাকে পূবসাগরের তীরের দিকে কী এক রহস্যময় আকর্ষণে টেনে আনছে। য়ুরোপীয় জাতির সীমাহীন অহংকার আজ অকস্মাৎ বাধা পেয়েছে এবং এতদিন যে ধারায় চলে এসেছে তার থেকে তার মন ফিরছে।

সুইডেন থেকে এরোপ্লেনে বার্লিন যাবার কথা হয়। এই সংবাদ শুনে সুইডেনের বিখ্যাত পরিব্রাজক পণ্ডিত সোয়েন হেডিন অত্যন্ত বিচলিত হলেন এবং প্রস্তাবটি তখনই নাকচ করে দিয়ে বললেন রবীন্দ্রনাথের মত মহামানবের অমূল্য জীবন একজন সুইডিশ পাইলটের হাতে ছেড়ে দেওয়া কখনও উচিত নয়। বলা বাহুল্য তখনকার দিনে এরোপ্লেন ভ্রমণ তেমন নিরাপদ হয় নি।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতায় যে রকম ভিড় হয়েছিল, সে রকম ভিড় ও দেশের লোকে কখনও দেখে নি বলে কাগজে লেখা হয়েছিল।

বার্লিনের একাডেমি (প্রুশিয়ান একাডেমি) ও গ্রন্থাগার পৃথিবীখ্যাত। এখানে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কণ্ঠস্বরের রেকর্ড ও হস্তলিপির নমুনা সযত্নে রাখা হয়। এইখানে রবীন্দ্রনাথের এক প্রবন্ধের খানিকটা ও মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি - এই বাংলা গানটির রেকর্ড তুলে চিরকালের জন্য রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

জার্মেনির মুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের যে বক্তৃতা হয়, তাতে টিকিট বিক্রয় করে প্রায় দশ হাজার টাকা ওঠে। রবীন্দ্রনাথ নিজে ঐ টাকা না নিয়ে যুদ্ধের পরে ক্ষুধাক্লিষ্ট জার্মান শিশুদের জন্য দিয়ে আসেন।

জার্মেনির ডার্মষ্টাট শহরে রবীন্দ্রনাথ যে এক সপ্তাহ ছিলেন সেটার নামকরণ হয় ঠাকুর-সপ্তাহ। চারিদিক থেকে লোক আসত নানা প্রশ্ন নিয়ে। বিকালের সভায় কবি জবাব দিতেন, দোভাষী সেগুলি জার্মান ভাষায় বুঝিয়ে দিত।

একদিন ডার্মষ্টাট শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিকদের আড্ডায় রবীন্দ্রনাথ গেলেন। শ্রমিকদের গ্রাহ্যই নেই ঘরে কে এল। মদের বোতল সামনে খোলা, চুরুটের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার— তারই মধ্যে গিয়ে কবি

বসলেন। ধীরে ধীরে দু চারটে কথা বলতে শুরু করলেন। যেমন দোভাষী সেগুলি অনুবাদ করলেন, দেখা গেল লোকদের মধ্যে একটু ভাবান্তর। মদের বোতল টেবিলের তলায় ঢোকালো, চুরুট নিবিয়ে পকেটে ভরল; আসনের উপর ঘুরে বসল—কবি কী বলছেন মন দিয়ে শোনবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে তাঁর জীবনে এত বড়ো বিজয় আর কখনও হয়নি।

স্পেশাল ট্রেনে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীরা পেকিং পৌঁছলেন। সঙ্গে ছিল সরকারী বিশেষ দেহরক্ষীর দল—পাছে কোথাও সম্মানিত অতিথির অবমাননা হয়। পেকিং ষ্টেশনে ছাত্র, অধ্যাপক, সাংবাদিক নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি—চীনা, জাপানী, ইংরেজ, আমেরিকান, এমন কি কয়েকজন ভারতীয় উপস্থিত। চারিদিক থেকে পুষ্পবৃষ্টি ও তার সঙ্গে চীনে রীতি অনুসারে পটকাবাজির কর্ণভেদী শব্দ! এর আগে পেকিং বিশ্ববিদ্যালয় ইংলণ্ড ও আমেরিকা থেকে অনেক পণ্ডিতকে আহ্বান করে এনেছিলেন, কিন্তু এরকম দৃশ্য কখনো কেউ দেখেনি। সকলের মনে প্রশ্ন এর কারণ কী? তোমরা বল তো এর কারণ কী? মিশর ভ্রমণ সম্বন্ধে তাঁর একটি চিঠির থেকে তুলে দিই:

> পরদিন কায়রোর (Cairo) পালা। ঘণ্টা চারেক গেল রেলগাড়িতে। পৌঁছলেম মধ্যাহ্নে। বৈকালেই সেখানকার সর্বোত্তম আরবি কবির বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ।···সেখানে ইজিপ্টের সমস্ত রাষ্ট্রনায়কের দল উপস্থিত ছিলেন। পাঁচটার সময় পার্লামেণ্ট বসবার সময়। আমার খাতিরে এক ঘণ্টা সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাকে জানানো হল, এমন ব্যবস্থা-বিপর্যয় আর কখনো আর কারো জন্য হতে পারত না।···

রবীন্দ্রনাথ বড়দের জন্য যেমন অনেক কবিতা লিখে গেছেন, তেমনি লিখেছেন তোমাদের মত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য। সহজ পাঠ, শিশু, শিশু-ভোলানাথ, চিত্রবিচিত্র, ছড়া, ছড়ার ছবি প্রভৃতি বইয়ে কত কবিতাই না তিনি তোমাদের জন্য লিখেছেন। এসব কবিতা পড়তে পড়তে ও শুনতে শুনতে তোমাদের মনে হয় না কি, তোমাদের মনের কথাগুলো তিনি কেমন করে জানলেন, আর সেগুলো কবিতায় লিখে ফেললেন। সকলের মনের কথা কবিতায় লিখতে পেরেছেন বলেই ত তিনি বড় কবি!

ছোট খোকা বলে অ আ
শেখেনি সে কথা কওয়া

থেকে সুরু করে

এসেছে শরৎ হিমের পরশ
লেগেছে হাওয়ার পরে
সকাল বেলায় ঘাসের আগায়
শিশিরের রেখা ধরে।

অথবা

একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু
'চেয়ে দেখো,' 'চেয়ে দেখো' বলে যেন বিনু।
চেয়ে দেখি ঠোকাঠুকি বরগা কড়িতে,
কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে।

কিম্বা

অঞ্জনা নদীতীরে চন্দনী গাঁয়ে
পোড়ো মন্দিরখানা গঞ্জের বাঁয়ে
জীর্ণ ফাটল ধরা—এক কোণে তারি
অন্ধ নিয়েছে বাসা কুঞ্জবিহারী।

এইসব কবিতা কী সুন্দর করে লিখেছেন, পড়ে তোমাদের ভাল লাগবে বলে।

একটি ছোট ছেলে রোজ পাঠশালায় যাবার পথে দেখে, তাদের বাড়ির গলি দিয়ে ফেরিওয়ালা চলেছে হাঁকতে হাঁকতে :

চুড়ি চাই চুড়ি চাই' সে হাঁকে,
চিনের পুতুল ঝুড়িতে তার থাকে

তাকে দেখে ও তার হাঁক শুনে ছেলেটির মনে কী হয় বল ত? তোমাদের মনে যা হয় তাই .

ইচ্ছে করে শেলেট্ ফেলে দিয়ে
অমনি করে বেড়াই নিয়ে ফেরি।

একদিন একটি ছোট মেয়ে একটি রঙিন পুতুল পাঠশালায় নিয়ে গিয়ে খাতার নিচে রেখে দিয়েছে। পড়া বলতে ভুল করেছে বলে গুরুমশাই রেগেমেগে পুতুলটা ভেঙে ফেলে দিলেন। এতে মেয়েটির মনে বড় দুঃখ। তার মায়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছে, কার কাছে নালিশ করতে পারলে গুরুমশায়ের একটা শাস্তির ব্যবস্থা হতে পারে :

মাগো আমি ডরাই কাকে ?
ওঁর কি গুরু আছে ?
আমি যদি নালিশ করি
এখনি তার কাছে ?

একটি ছোট ছেলে কেবলি মা'র কাছে বকুনি খায় আর শোনে সে বড় দুষ্টু, মা'র কথা শোনে না, রোদে জলে ঘুরে বেড়ায়, লেখাপড়ায় মন নেই—তাই সে মা'কে জিজ্ঞাসা করছে :

বাবা আমার চেয়ে ভালো ? সত্যি বল তুমি,
তোমার কাছে করেন না কি একটুও দুষ্টুমি ?

যা বল সব শোনেন তিনি কিছু ভোলেন নাকো,
খেলা ছেড়ে আসেন চলে যেমনি তুমি ডাকো ?

ছোট্ট বীরপুরুষের ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করে মা'কে উদ্ধার করার কবিতা তোমরা নিশ্চয়ই জানো। সে কবিতাটা এবং আরও কয়েকটা কবিতা রবীন্দ্রনাথ নিজে আবৃত্তি করেছেন গ্রামোফোন রেকর্ডে, তাঁর গলার স্বর তোমরা শুনবে বলে। নিশ্চয়ই তোমরা শুনেছ আশা করি যদি না শুনে থাক, তাহলে অবশ্যই শোনবার চেষ্টা কোরো, দেখবে রবীন্দ্রনাথ কী সুন্দর আবৃত্তি করতেন।

ওরে তোরা কি জানিস কেউ
জলে কেন ওঠে এত ঢেউ ?
ওরা দিবসরজনী নাচে,
তাহা শিখেছে কাহার কাছে ?
শোন্ চল্ চল্ ছল্ ছল্
সদাই গাহিয়া চলেছে জল।

এই ভাবে জল বয়ে যাবার সহজ গতিবেগের ছন্দে ১৩।১৪ পাতা লম্বা কবিতাটি তর তর বয়ে চলেছে। পড়তে পড়তে কত বিচিত্র ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে তা বলে শেষ করা যায় না। এমন সুন্দর বর্ণনা ও এত সহজ ভাষায় লেখা এত বড় একটা কবিতা, কিন্তু তার মধ্যে জোড়া কথা (যুক্তাক্ষর) নেই বললেই হয়। বল তো কবিতাটার নাম কী ? যারা পড়নি, তারা অবশ্যই পড়ে দেখো খুব আনন্দ পাবে।

এই রকম কত যে কবিতা তিনি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য লিখেছেন তা আর কী বলব ! তোমাদের মধ্যে যারা একটু বড়, তারা কথা ও কাহিনীর অতুলনীয় কবিতাগুলো নিশ্চয়ই পড়েছ। মস্তকবিক্রয়

সামান্য ক্ষতি, পূজারিনী, বন্দীবীর, পণরক্ষা, দুই বিঘা জমি পুরাতন ভৃত্য, প্রভৃতি কবিতা পড়েনি এবং পড়ে আনন্দ পায়নি এমন ছেলেমেয়ে কি কেউ আছে? বল তো এই লাইন-দুটি কোন কবিতায় আছে. যা চেয়েছ তার কিছু বেশী দিব, বেণীর সঙ্গে মাথা। এই বইয়ের দুটি কাহিনী অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ দুটি বিখ্যাত ও সর্বজনপ্রিয় নৃত্যনাট্য লিখেছেন তা আশা করি তোমাদের অজানা নেই।

আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমো
তোমায় স্মরি. হে নিরুপম,
নৃত্যরসে চিত্ত মম উছল হয়ে বাজে।

এই বিখ্যাত গান কোন্ নাটিকার অন্তর্গত তা কি জান? জান কি সে-নাটক কোন্ কবিতার নাট্যরূপ?

নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ গগন-ললাট, চুমে তব পদধূলি,
ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।

বাংলাদেশের এমন সুন্দর ছবি কোন কবিতায় আছে, তা তোমাদের জিজ্ঞাসা করা বাহুল্য, নিশ্চয় জান।

ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর-কেষ্টা চাকরের নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে মনিবের প্রাণ বাঁচানোর কথা পড়ে তোমরা তার প্রতি কত সহানুভূতি প্রকাশ করে থাক।

কত বলব? অপূর্ব বীরত্বের, ত্যাগের, আত্মদানের, প্রভুভক্তির বিচিত্র কাহিনীর সুন্দর সুন্দর কবিতা এই বইখানিতে আছে—যারা পড়েছ তারাই জান। যারা জাননা তারা অবশ্যই পড়বে তা বলা বাহুল্য।

লক্ষ্মীর পরীক্ষা নাটিকা কোনো না-কোনো সময়ে অভিনয় করেনি,

এমন মেয়ে খুব কমই আছে। নিজে অভিনয় না করলেও তোমরা অনেকেই এই নাটিকার অভিনয় দেখেছ। সরল সুন্দর কবিতায় লেখা মেয়েদের উপযোগী এমন একখানি নাটিকা বাংলা সাহিত্যে আর নেই। যারা অভিনয় করে এবং যারা দেখে ও শোনে তারাও এর সৌন্দর্য অনুভব করে।

বেগম সাহেব যখন হাঁচেন,
তুড়ি ভুল হলে কেহ না বাঁচেন।
তখনি শূলেতে চড়িয়ে তারে
নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচিয়ে মারে।

এমন উদ্ভট শাস্তির কথা শুনে কে না আমোদ পায়?

একদিকে তাঁর কবিতা ও নাটক পড়ে তোমরা আনন্দ পাও অন্যদিকে তাঁর লেখা গল্প উপন্যাস পড়ে তোমাদের কত ভাল লাগে। ছোটদের জন্য লেখা তার রাজর্ষি উপন্যাস তোমাদের মধ্যে অনেকে পড়েছ। মুকুট নাটিকায় বা হাস্যকৌতুকে অভিনয় করনি এমন কি কেউ আছ? তা ছাড়া তাঁর ছোট গল্পের ভাণ্ডারে তোমাদের উপযোগী গল্পের অভাব নেই, সে-কথা আগেই বলেছি।

এই ভাবে দেখ, তিনি আমাদের সকলের— ছোট এবং বড় সকলের মনের মত কত লেখাই লিখেছেন তার মাপজোখ নেই। ছোটদের জন্য লেখা কিছু কিছু বইয়ের নামমাত্র করলাম সব বইয়ের নয়। তাছাড়া বড়দের জন্য লেখা কত অসংখ্য বই আছে, তা তোমরা বড় হয়ে জানতে পারবে। তার লেখা পড়ে আমাদের ভাল লাগে বলেই তিনি আমাদের প্রিয়—তাই প্রতিবৎসর তার জন্মদিনে সবাই মিলে তাঁর লেখা কবিতা আমরা আবৃত্তি করি, গান করি, নাটকের অভিনয় করি। তাকে আমাদের কত আপনার জন মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের লেখা কখনও আমাদের কাঁদায়, কখনও হাসায়, কখনও প্রাণে উৎসাহ

আনে, কর্মে অনুপ্রেরণা জাগায়,— তাইতো বাংলার আর এক জন কবি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখেছেন :

হাসাও তুমি, কাঁদাও তুমি, নাচাও তুমি রঙ্গে

তোমাদের সব আনন্দ উৎসবে তোমরা আজকাল নাচগান করে থাকো— নাচ না হলে জল্‌সা যেন সম্পূর্ণ হল না বলে মনে কর। বছর পঁচিশ আগে একথা কেউ ভাবতেই পারত না— ছেলেমেয়েদের নাচ সকলে নিন্দার বিষয় বলে মনে করত— তেমনি মনে করত প্রকাশ্য সভায় মেয়েদের গান। রবীন্দ্রনাথই আমাদের দেশে স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে নাচ ও গানের প্রচলন করেছেন। বছর বছর নানা গীতিনাট্য রচনা করেছেন আর শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের নিয়ে নানা শহরে সে সব অভিনীত করে লোকের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন এনেছেন।

সভাসমিতি সাজানোর সুচারু পদ্ধতি আজ তোমরা যা শিখেছ এর মূলেও হচ্ছে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত শিক্ষা। আমাদের উৎসবাদিতে অভিনব রূপসজ্জা, আলপনা প্রভৃতির প্রচলন, রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় উদ্ভূত শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপদ্ধতি আজ দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে। এ কথাগুলি তোমরা মনে রেখো। বড় হয়ে তোমরা তাঁর লেখা যত পড়বে, তাঁর জীবনী যত আলোচনা করবে, ততই দেখবে রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা কতরকমে ঋণী—তিনি কতভাবে আমাদের চাল চলন, কথন বলন, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন এনেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

আমাদের চারিদিকের বিশ্বপ্রকৃতির অহরহ পরিবর্তন ও তার সৌন্দর্যের দিকে আমাদের চোখ ও মন ফিরিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের চারি পাশে গাছ পালা, পাহাড় পর্বত, নদ নদী, সবুজ ধানের ক্ষেত, ফলের গাছ, ফুলের বাগান—সেখানে কত পাখী ডাকছে, কত

সুন্দর গন্ধ— সূর্যোদয়ে সূর্যাস্তে কত রঙের খেলা, আকাশজুড়ে মেঘের মেলা, নববর্ষার নিবিড় জল ধারা- এ সব দেখে আমাদের মনে কত আনন্দ হয়—কিন্তু সে-আনন্দ আমরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারিনে। অসংখ্য কবিতা গানে চারদিকের সৌন্দর্যের কথা, ঋতুপরিবর্তনের কথা রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন—সে সব গান গাই, কবিতা পড়ি আর কত আনন্দ পাই! ঋতুতে ঋতুতে নানা উৎসবের ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে প্রবর্তিত করেন। এখন অন্য অনেক জায়গায় তোমরা বর্ষামঙ্গল, বসন্তোৎসব, শারদোৎসব প্রভৃতি করে থাক।

গ্রীষ্মের গরমে আমরা যখন ছটফট করে উঠি তখন রবীন্দ্রনাথের রচিত গান গেয়েই মনের কথা বলি :

দারুণ অগ্নিবাণে
হৃদয় তৃষায় হানে।
রজনী নিদ্রাহীন, দীর্ঘ দগ্ধদিন,
আরাম নাহি যে জানে।

এই অবস্থায় তখন আপনা থেকেই মনে প্রার্থনা ওঠে :

এস হে এস সজল ঘন, বাদল বরিষণে··

নববর্ষার বারিধারা যখন বিপুল সমারোহে আসে, আমরা বলি :

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জল সিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে
ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা ···।

ঘন বরষার বারি বর্ষণে আমরা গাই :

আজ বারি ঝরে ঝরঝর ভরা বাদরে
আকাশভাঙা বৃষ্টি ধারা কোথাও না ধরে।

মেঘে ঢাকা আকাশের দিকে চেয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি :

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে।

আর শরতের সোনার রোদে আমরা গাই :

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা
নীল আকাশে কে ভাসালে
শাদা মেঘের ভেলা।

কিম্বা

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি
আজ আমাদের ছুটিরে ভাই
আজ আমাদের ছুটি।

এইভাবে প্রত্যেক ঋতুতে রবীন্দ্রনাথের গান কবিতা আমাদের মনকে কীভাবে আলোড়িত করে, তা শুধু আমরা অনুভবই করতে পারি—ভাষায় ব্যক্ত করতে পারিনে। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ আমাদের এত প্রিয় এত আপনার।

বাংলা দেশকে আমরা কে না ভালবাসি। কবির সঙ্গে সঙ্গে আমরাও গাই :

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

আমাদের মনে দেশের প্রতি যে-ভালবাসা আছে সে-ভালবাসার প্রকাশ আমরা করি কবির গানে, কবিতায়, রচনায়—সেই জন্যই তিনি আমাদের এত প্রিয়।

ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অপরাধে একজন দেশসেবকের ফাঁসির হুকুম হল। দেশকে সে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসে, দেশের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে পারছে বলে সে গর্বিত মনে করছে তার জন্ম সার্থক—তাই দণ্ডাজ্ঞা পাবার পর আদালতে বিচারকের সামনেই সে রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে উঠল·

সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো,
তোমায় ভালবেসে।

যে কবির গান গেয়ে দেশসেবক ফাঁসিকাঠের দিকে হাসিমুখে এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা পায়, সে-কবি আমাদের অন্তরঙ্গ দরদী বন্ধু যদি না হন, তাহলে আর কে? তাঁকে আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসা দেব না, তাঁর জন্মশতবার্ষিকী করব না, ত কার করব? তিনি আমাদের কাছ থেকে কী চেয়েছেন?

ধন নয়, মান নয়, শুধু ভালবাসা
করেছিনু আশা।

স্বদেশী আন্দোলনের সূচনায় আমরা পরস্পরের হাতে রাখি বেঁধে কবির ভাষাতেই প্রার্থনা করেছিলাম:

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা,
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান।

আজ কবির জন্মশতবার্ষিকীর দিনে আমরা প্রার্থনা করি:

'বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন,
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।

বাংলার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, সব শেষে তোমাদের বলি : আমাদের জাতিগঠনের কাজের মূলে রবীন্দ্রনাথের যে-সকল চিন্তা ও কাজ রয়েছে তার কথা তোমাদের ভাল করে জানতে হবে, বুঝতে হবে, মনে রাখতে হবে। কি রাষ্ট্রিক, কি আর্থিক, কি সামাজিক, কি আধ্যাত্মিক, সকল ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় দানের কথা তোমরা কখনো ভুলোনা। আর ভুলোনা তোমাদের জীবনকে, দেশকে, আশেপাশের অবস্থাকে তোমাদের গড়ে তুলতে হবে সেই আদর্শে, যে আদর্শ রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে দিয়ে গেছেন। এ সব যদি পার, তবেই তাঁর প্রতি তোমাদের কর্তব্য করা হবে, তাঁর জন্মশতবার্ষিক উৎসব সার্থক হবে, বৎসরে বৎসরে পঁচিশে বৈশাখে তাঁর জন্মোৎসব পালনে তোমরা যোগ্য হবে। কেবল তাঁর লেখা গান গাইলে হবে না, তাঁর অমর লেখনী নিঃসৃত কবিতা আবৃত্তি করলে হবে না, তাঁর রচিত নৃত্যনাট্যের অভিনয় করে আনন্দ পেলে ও দিলে চলবেনা. তিনি যা করতে বলেছেন, যা হতে বলছেন, যে-আদর্শ দিয়ে গেছেন, সেই আদর্শ সামনে রেখে তোমাদের চলতে হবে নিজেদের জীবনকে বড় করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে দেশ বড় হবে, আর তোমাদের জীবনে রবীন্দ্রনাথ অমরত্ব লাভ করবেন। আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগিবে সকল দেশ—এ বাণী সত্য হবে। তোমাদের জীবনে সেই মন্ত্র গ্রহণ করতে হবে যে-মন্ত্র তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠাদিবসে ব্রহ্মচারী বটুদের দিয়েছিলেন. তবেই তাঁর প্রতি তোমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতির অর্ঘ সত্য হবে। সেই মন্ত্র হল সত্যমেব জয়তে—আমাদের দেশের মন্ত্র। তোমাদের সকল হৃদয় মন দিয়ে এই মন্ত্র সর্বদা জপ কোরো :

মোরা সত্যের পরে মন আজি করিব সমর্পণ,

জয় জয় সত্যের জয়।

মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য, খুঁজিব সত্যধন,
জয় জয় সত্যের জয়।
যদি দুঃখে দহিতে হয়, তবু মিথ্যা চিন্তা নয়,
যদি দৈন্য বহিতে হয়, তবু মিথ্যা কর্ম নয়,
যদি দণ্ড সহিতে হয়, তবু মিথ্যা বাক্য নয়,
জয় জয় সত্যের জয়।

এই লেখা শেষ হয় ১১ জুলাই ১৯৬০ তারিখে। লেখক বাইশ দিন পরে ২ আগস্ট তারিখে তাঁর পূর্বপল্লীর বাড়িতে পরলোকগমন করেন। তিনি এই প্রথম খসড়া সংশোধন করার অবসর পাননি।

সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়

১৩ আষাঢ় ১৩০৬—১৭ শ্রাবণ ১৩৬৭

সুহৃৎকুমার শান্তিনিকেতনে আসেন দশ বছর বয়সে। ছয় বছর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে অধ্যয়নের পর ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি আশ্রম ত্যাগ করে যান। কুড়ি বছর বয়সে স্কটিশ চার্চেস কলেজ থেকে বি. এস. সি. (অনার্স) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি অল্পদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। ১৯২২ সালে ব্রহ্মদেশে চলে যাবার পর, তিনি তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে শান্তিনিকেতনে একসঙ্গে বেশি দিন থাকতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর মন শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ থেকে কোনো দিন দূরে থাকে নি। আশ্রমের আদর্শের প্রতি বিশ্বাস তাঁর কোনো দিন টলে নি। মহর্ষি ও গুরুদেবের সাধনা ও বাণী চিরদিন তাঁর কর্মে ও চিন্তায় প্রেরণা জুগিয়েছিল। শান্তিনিকেতনের যে-শিক্ষা ছিল তাঁর জীবনের অমূল্য সম্পদ,—তা তাঁর অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অনির্বাণ শিখার মত দীপ্যমান ছিল।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে বালক সুহৃৎকুমার 'সু'-নামে পরিচিত ছিলেন। অতি অল্প বয়স থেকে আশ্রমের সমস্ত কল্যাণকর্মের সঙ্গে সর্বদা 'সু' যুক্ত থাকতেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণ পরিষ্কার করা, সাঁওতাল-গ্রামের ছেলেদের পড়ানো, ছেলেদের হাতে পোঁতা গাছপালার যত্ন নেওয়া, হাতে-লেখা পত্রিকার সম্পাদনা করা— এই ধরনের কাজে 'সু'র উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুহৃৎকুমার আরো দায়িত্ব গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন। তাঁর স্বভাবের মাধুর্য,

কর্তব্যে নিষ্ঠা, কাজে উৎসাহ ও নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতার জন্য তিনি আশ্রমবাসী সকলের প্রিয় হয়ে ওঠেন। বিদেশী অতিথিরাও তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও সকলকে আপন করে নেবার ক্ষমতার জন্য অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হতেন।

শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার সময় সুহৃৎকুমার অত্যন্ত মূল্যবান একটি কাজ করেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমের একটি পরিপূর্ণ রূপের পরিচয় বাইরের জগতের কাছে দেবার জন্য তিনি বহু যত্নে অনেকগুলি ম্যাজিক লণ্ঠন স্লাইড্ করিয়ে রাখেন। যখন সুবিধা হয়েছে তখনই তিনি ব্রহ্মদেশে শান্তিনিকেতনের ছবি দেখিয়ে 'ল্যাণ্টর্ন লেকচার' দিয়েছেন। শান্তিনিকেতনেও তিনি এই স্লাইডগুলি একাধিকবার দেখিয়েছেন। এ ছাড়া গুরুদেবের বহু চিঠিপত্র, নিজের হাতে তোলা ফোটো, রচনার পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি তিনি সযত্নে রক্ষা করেছেন নানা বিপর্যয়ের মধ্যে। গুরুদেবের গলার স্বর ও ছবি যে ভবিষ্যতের মানুষের কাছে কত মূল্যবান হবে তা তিনি বুঝতে পারতেন, তাই বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষকে তিনি বার বার অনুরোধ করেছেন গুরুদেবের জীবদ্দশায় তাঁর রেকর্ড ও ফিল্ম যেন বেশি করে তুলে রাখা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, সুহৃৎকুমার ছাত্রাবস্থা থেকে নিয়মিত দিনলিপি লিখে রাখতেন। তা ছাড়া বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে শান্তিনিকেতন থেকে যেসব চিঠি লিখতেন—তার প্রধান বিষয় হত আশ্রমের খবর। এইসব লেখা থেকে তাঁর দাদা শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনী-রচনায় প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

সুহৃৎকুমারের কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় বাংলার বাইরে কাটে। কিন্তু যেখানে যখন থেকেছেন রবীন্দ্র-সংগীত, রবীন্দ্র-নাট্য ও রবীন্দ্র-

নাথের কবিতা নানা অনুষ্ঠানের সাহায্যে লোকের কাছে পরিবেশন করেছেন, সাহিত্য-চক্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চায় সবাইকে উৎসাহ দিয়েছেন। বোম্বাই প্রদেশের পুণা শহর ও ব্রহ্মদেশের বেসিন শহরের বাঙালীরা তাঁর কাছে কত ভাবে ঋণী তা তাঁরা কোনো দিন ভুলতে পারবেন না।

সুহৃৎকুমারের জীবনের আরো কয়েকটা দিকের উল্লেখ না করলে তাঁর জীবনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সুহৃৎকুমার শিক্ষাব্রতী ছিলেন, কিন্তু তাঁর অধ্যাপনা বিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যে কোনোদিন সীমাবদ্ধ ছিল না। গান, আবৃত্তি, অভিনয় ও শিশু পাঠাগারের মাধ্যমে তিনি আশ্চর্যভাবে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বেসিন ও পুণার বাঙালী ছেলেমেয়েদের অনুরাগ জন্মিয়েছিলেন। এখানে বলা প্রয়োজন এই দুই জায়গায় বিদ্যালয়ে বাংলা শেখার সুযোগ ছেলেমেয়েরা পেত না। শিক্ষাব্রতী সুহৃৎকুমারের বিজ্ঞান পড়ানোর একটা দিক তাঁর বহু ছাত্রছাত্রী সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রাখবে— সেটা হল বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে জ্ঞান ও শিক্ষা দেবার উৎসাহ। হাতে-কলমে কি ভাবে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরি করা যায় তা তিনি গভীর আনন্দের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের শিখিয়েছেন আজীবন।

আশ্চর্য সংগঠন শক্তি ছিল তাঁর। শুধু যে এক হাতে দুই তিনটি সংস্থার সম্পাদকের কাজ অনায়াসে চালিয়েছেন তা নয়, সারা ব্রহ্মদেশের Inter-School Physical Training Competition-এর মত একটি বৃহৎ ব্যাপার, বেসিন শহরে তিনি প্রায় একাই সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছিলেন।

সুহৃৎকুমারের মত এমন ভাবে একটি মানুষের মধ্যে এত গুণে সমাবেশ খুব কমই চোখে পড়ে। শিশুর মত সরল ছিল তাঁর ম· তাঁর স্নেহ শুধু তাঁর পরিবার-পরিজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ন পরিচিত স্বল্পপরিচিত কত লোক যে তাঁর স্নেহ ভালবাসা পেয়ে ধ হয়েছে তা বলা যায় না। কর্তব্যকর্মে ও সত্যনিষ্ঠায় তাঁর দৃঢ়তার কথাং কেউ সহজে ভুলবে না। তাঁর নিকট সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁর জানেন সুহৃৎকুমারের মন এমন একটি সুরে বাঁধা ছিল যে জীবনের সুখ দুঃখ তাঁকে অতি অল্পই বিচলিত করতে পেরেছে। পূতচরিত্র আশ্রম-গুরুর কাছে জীবনের মূল্যবোধ সম্বন্ধে যে-শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন তা কোনো দিন হারাননি। তাই সব ঝড় ঝঞ্ঝা, লাভ ক্ষতিকে উপেক্ষা করে তিনি হাসিমুখে বলতে পারতেন : ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে। কেউ বিমর্ষ হয়ে পড়লে বলতেন : তেমন করে হাত বাড়ালে সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের 'সু' চেয়েছিলেন আশ্রমেই তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাবেন—মহর্ষি ও রবীন্দ্রনাথের সাধনভূমিতে যেন তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়ে। তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল, শেষ নিঃশ্বাস দিয়ে তিনি তাঁর বালক বয়সে শেখা আশ্রমের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন : পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি…।

তাঁর জীবনের শেষকৃত্যরূপে সুহৃৎকুমার এই রবীন্দ্রজীবনকথা নিবেদন করে গেছেন। রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিক উৎসবে অনেকে অনেক অর্ঘ্য নিয়ে এসেছেন। সুহৃৎকুমারের এই শেষ লেখা উৎসবে সাজিয়ে দেবার মত অন্যতম একটি অর্ঘ্য।